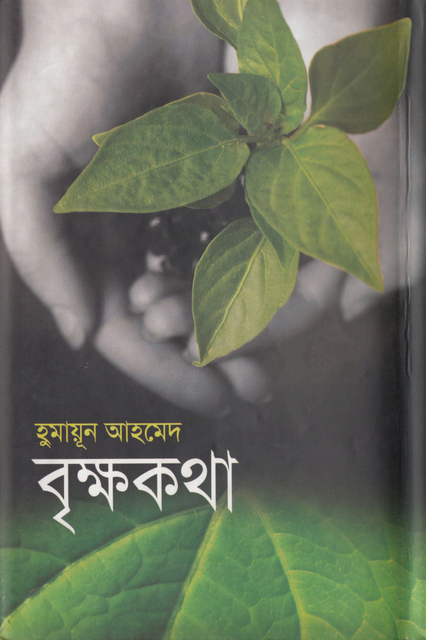

হুমায়ূন আহমেদ

বৃক্ষকথা

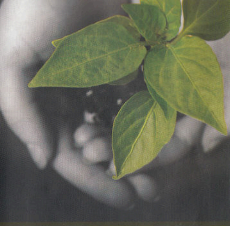

বাংলাদেশে বৈচিত্র্য ও প্রকার অনুযায়ী সবচেয়ে বড় ঔষধি বৃক্ষের বাগান রয়েছে গাজীপুরের হোতাপাড়ায় অবস্থিত নুহাশ পল্লীতে। এখানে রয়েছে শতাধিক ঔষধি বৃক্ষ— আদা, কদম্ব, গাঁজা, বেল, বাসক, বকফুল, শেওড়া, পারিজাত, জয়তন, অশ্বগন্ধা...। এই ঔষধি বাগানটি গড়ে তুলেছেন বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখক হুমায়ূন আহমেদ।

হুমায়ূন আহমেদের বৃক্ষপ্রেমের পরিচয় শুধু তাঁর নিজের তৈরি নন্দনকানন নুহাশ পল্লীই নয়, তাঁর গল্প-উপন্যাসের পাঠকরা জানেন যে, তার নানা লেখায়ও রয়েছে বৃক্ষপ্রেমের নিদর্শন।

বৃক্ষপ্রেমিক হুমায়ূন আহমেদ ৫০টি ঔষধি বৃক্ষের নানা গুণাগুণ আর মজার সব তথ্য নিয়ে লিখেছেন 'বৃক্ষকথা' বইটি।

প্রচ্ছদ :: মাসুম রহমান

বাংলা কথাসাহিত্যের ভুবনে প্রবাদ পুরুষ। গত পঁয়ত্রিশবছর ধরেই তাঁর তুঙ্গস্পর্শী জনপ্রিয়তা। এক সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। অধ্যাপনা ছেড়ে হঠাৎ করেই চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু করেন। *আগুনের পরশমণি, শ্রাবণ মেঘের দিন, দুই দুয়ারী, চন্দ্রকথা, শ্যামল ছায়া, নয় নম্বর বিপদ সংকেত, আমার আছে জল...* ছবি বানানো চলছেই। ফাঁকে ফাঁকে টিভির জন্যে নাটক বানানো।

এ দেশের সর্বোচ্চ সম্মান একুশে পদকসহ অসংখ্য পুরস্কার পেয়েছেন। দেশের বাইরেও তাঁকে নিয়ে প্রবল আগ্রহ। তাঁর বেশ কটি উপন্যাস ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে। একটি উপন্যাস 'গৌরীপুর জংশন' সাতটি ভাষায় অনুবাদের কাজ চলছে। ইতোমধ্যে এই উপন্যাসের ইংরেজি, জার্মান, হিন্দি ও ফার্সি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

মানুষ হিসেবে তাঁকে তাঁরই সৃষ্ট চরিত্র হিমু এবং মিসির আলির মতোই রহস্যময় বলে মনে হয়। তাঁর বেশিরভাগ সময় কাটে নিজের তৈরি নন্দনকানন 'নুহাশ পল্লী'তে।

আলোকচিত্র :: মাজহারুল ইসলাম

বৃক্ষকথা

হুমায়ূন আহমেদ

অন্যপ্রকাশ

প্রথম প্রকাশ | একুশের বইমেলা ২০০৯

© | মেহের আফরোজ শাওন

প্রচ্ছদ | মাসুম রহমান

প্রকাশক | মাজহারুল ইসলাম
অন্যপ্রকাশ
৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২৫৮০২ ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৯৬৬৪৬৮১

মুদ্রণ | কালারলাইন প্রিন্টার্স
৬৯/এক গ্রীনরোড, পান্থপথ, ঢাকা

মূল্য | ২০০ টাকা

আমেরিকা পরিবেশক | মুক্তধারা
জ্যাকসন হাইট, নিউইয়র্ক
www.muktadhara.com

যুক্তরাজ্য পরিবেশক | সঙ্গীতা লিমিটেড
২২ ব্রিক লেন, লন্ডন

কানাডা পরিবেশক | এটিএন বুক এন্ড ক্রাফটস
২৯৭০ ড্যানফোর্থ এভিনিউ, টরেন্টো

Brikkhakatha | by Humayun Ahmed
Published by Mazharul Islam
Anyaprokash
Cover Design : Masum Rahman
Price : Tk. 200.00 only
ISBN : 984 868 542 1

নুহাশ পল্লীর বৃক্ষদের-কে

ভূমিকা

আমার খুব পছন্দের একটা হাদিস দিয়ে শুরু করি। নবিজি (দ.) বলছেন, 'যদি তুমি জানো পরের দিনই রোজ কেয়ামত, তারপরেও একটি গাছ লাগিও।'

গাছ লাগানোর কোনো সুযোগ আমার ছিল না। সারাজীবন বাস করেছি শহরে। কংক্রিট খুঁড়ে তো আর চারা লাগানো যায় না। অনেকেই দেখি টবে গাছ লাগান। ব্যাপারটা আমার ভালো লাগে না। টবে গাছ লাগানোর অর্থ গাছের ভুবন সীমিত করে ফেলা। এমনিতেই বেচারা হাঁটতে পারে না।

অনেককেই দেখি 'বনসাই' নিয়ে উত্তেজিত। বিশাল বটবৃক্ষকে বামুন বানিয়ে উত্তেজিত হবার কী আছে? একটি বিশাল প্রাণকে সঙ্কুচিত করার অপরাধে তারা অপরাধী। বৃক্ষদের হাতে শাসনক্ষমতা থাকলে এই অপরাধে তারা যাবজ্জীবন শাস্তির ব্যবস্থা করত। মানবজাতি ভাগ্যবান, বৃক্ষের হাতে শাসনক্ষমতা নেই।

প্রায় দশবছর আগে নুহাশ পল্লীতে আমি নিজের হাতে আটটা ঝাউগাছ লাগাই। তখন কল্পনাও করি নি, এই ছোট ছোট চারা আকাশ স্পর্শ করার স্পর্ধা নিয়ে বড় হবে। আমি যতবার নুহাশ পল্লীতে যাই, একবার হলেও ঝাউগাছগুলির পাশে গিয়ে দাঁড়াই। তাদের স্পর্শ করে বলি— 'এই তোদের আমি নিজের হাতে লাগিয়েছি! আজ যে তোরা এত বড় হয়েছিস, তার মূলে কিন্তু আমি। আমাকে Hello বল।'

ঝাউগাছগুলি আমাকে Hello বলে। তাদের ভাষায় বলে। অন্যরা না বুঝলেও আমি বুঝি। ঝাউগাছ দিয়েই আমার বৃক্ষরোপণ শুরু। যেখানে যে গাছ পাই, নুহাশ পল্লীতে লাগিয়ে দেই। নিতান্তই অপরিকল্পিত বৃক্ষরোপণ। কাঁঠালগাছের পাশে গোল মরিচের গাছ। তখনো জানি না গোলমরিচ গাছ অন্য এক গাছকে জড়িয়ে না ধরে বড় হতে পারে না। সে তার জীবনীশক্তি বড় কোনো গাছ থেকে নেয়।

এখন আমি গাছপালা সম্পর্কে কিছু জানি। দুনিয়ার বই পড়ছি, ইন্টারনেট ঘাঁটছি— কেন জানব না? যা কিছু জেনেছি তা অন্যদের জানাতে ইচ্ছা করছে। আমার মূল আগ্রহ ঔষধি গাছ। আমার কেন জানি মনে হয়, একসময় এদের কাছেই আমাদের ফিরে যেতে হবে।

হুমায়ূন আহমেদ
নুহাশ পল্লী
গাজীপুর

সূচি

আদা	১১
কদম্ব	১৩
গাঁজা	১৬
বেল	১৯
পান	২২
বাসক	২৪
অগুরু বা অগর	৩৪
কলকে/সৌভাগ্য বাদাম বৃক্ষ	৩৬
তেঁতুল	৩৮
বাজনা	৪০
কাঁকড়ার চোখ	৪১
নিসিন্দা	৪৩
বিলম্বী	৪৬
নিম	৪৭
খয়ের	৫৭
কৃষ্ণবট	৫৯
ঘেটু	৬০
পুত্রঞ্জীব	৬২
রাণীর ফুল/জারুল	৬৩
লটকন	৬৪
হিং	৬৫
বরুন	৬৮
তেলাকুচা	৭০
করমচা	৭২
পপি	৭৪
উদয়পদ্ম	৭৬
নীলমণি লতা	৭৬
মাধুরী লতা	৭৭
বাগান বিলাস	৭৭
জবা	৭৮
ঘৃতকুমারী	৮০
মৃত্যুফুল	৮২
বকফুল	৮৩
ওলট কম্বল/শয়তানের তুলা	৮৫
ওলট চণ্ডাল/অগ্নিজিহ্বা	৮৭
বনকলা না-কি কলাপতি ?	৯৭
আম	৯৮
কাঁঠাল	১০২
বিছুটি	১০৫
লজ্জাবতী	১০৬
আতা	১০৮
ঢেঁকি শাক	১১০
তালগাছ	১১১
শয়তানের গাছ/ছাতিম	১২১
গাব	১২২
ধূপগাছ/গুগগুল	১২৪
বকুল/সদাপুষ্প	১২৫
মাকাল	১২৭
রিঠা	১২৮

আদা

'বেহেশতে তোমাকে দেয়া হবে আদা মিশ্রিত পানীয়।'
আল কোরান, সূরা দাহর

'And they shall drink therin a cup tempared with Zanjabil (Ginger).'

আদার মতো নগণ্য কন্দমূল যা বাংলাদেশের ঝোপঝাড়ে জন্মে, তার স্থান হয়েছে বেহেশতের পানীয়তে ? অদ্ভুত ব্যাপার না ?

বিপুল উৎসাহে কোনো কাজে লেগে পড়াকে আমরা বলি 'আদা জল খেয়ে লাগা'। এই বাগধারাইবা কেন এসেছে ? আদা পানি খেয়ে দেখেছি— অতি অখাদ্য। আমেরিকায় Ginger Beer নামের এক ধরনের পানীয় আছে। আদা, চিনি, ক্রিম অব টারটার পানিতে মিশিয়ে ইস্ট দিয়ে ফার্মেন্টেড করে এই পানীয় তৈরি। সেটাও অখাদ্য। (অখাদ্য না বলে অপেয় বলা উচিত। তবে অখাদ্য শুনতে ভালো লাগে)।

আদার রসায়ন হচ্ছে— আদায় আছে শতকরা দুই ভাগ 'Essential oil' যার প্রধান অংশ Zingiberene. আদার ঝাঁঝালো ব্যাপারটা আসে Zingerene থেকে। কিছু লবণ থাকে (Potassium Oxalate) আর থাকে Terpenoids (Comphene, cineol, citral, Shogaol, gingerol, borneol ইত্যাদি)।

ভেজা (আর্দ্র) মাটিতে জন্মে বলেই এর নাম আর্দ্রক। বোটানিক্যাল নাম *Zingiber officinale* Rose. আদার ফ্যামিলি Zingiberaceae. এই ফ্যামিলির কয়েকটি প্রজাতি পৃথিবীতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। নওয়াজেশ আহমেদের লেখায় পড়েছি (*বাংলার বনফুল*) বাংলাদেশের পাহাড়ি অঞ্চলে এর এক প্রজাতি আছে বনআদা (Wild ginger). যার বোটানিক্যাল নাম *Zingiber spectabile.*

তিব্বিয়া হাবিবিয়া ইউনানী কলেজের প্রভাষক হেকিম হযরত মাওলানা মোঃ মোস্তফা 'আম আদা' নামের এক আদার উল্লেখ করেছেন (*রোগোপকারী গাছগাছালি ও লতাপাতা*)। এই আদা শুধু আচার তৈরিতে ব্যবহার হয়। আমি এ ধরনের আদার কথা শুনি নি।

ভারতীয় এবং চৈনিক ভেষজবিদরা আদার ঔষধি গুণাগুণ হাজার বছর আগেই জানতেন। অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা নানান রোগে আদা ব্যবহার করে

আসছেন। আয়ুর্বেদাচার্য শিবকালী ভট্টাচার্য রোগ প্রতিকারে আদার যেসব ব্যবহারের কথা বলেছেন তার কয়েকটি হলো—

অক্ষুধায় এবং অরুচিতে

খাবারের আগে সৈন্ধব লবণ দিয়ে সামান্য আদা খাওয়া।

সর্দি জ্বরে

আদার রসে মধু মাখিয়ে খাওয়া।

নেফ্রোইটিসে

রোগীর খাবারের সঙ্গে আদার রস বা শুঁঠের (শুকনা আদা) গুঁড়া মিশিয়ে খাওয়া।

পুরনো আমাশয়

গরম পানিতে শুঁঠের গুঁড়া মিশিয়ে খাওয়া।

মাড়ি ফোলা রোগে

দাঁতের গোড়ায় যন্ত্রণা এবং মাড়ি ফুলে রক্ত বের হলে গরম পানিতে দু'চামচ আদার রস মিশিয়ে দশ-পনেরো মিনিট মুখে রাখতে হবে।

রক্তপাত বন্ধ করতে

শুকনো আদাগুঁড়া (শুঁঠ) কেটে যাওয়া জায়গায় চেপে ধরলে রক্তপাত বন্ধ হবে।

আমি নিজে আদা-চিকিৎসার ভেতর দিয়ে কখনো যাই নি। সিগারেট ছাড়ার কৌশল হিসেবে কিছুদিন শুকনা আদা চিবিয়েছি। লাভের মধ্যে লাভ এই হয়েছে, সিগারেট খাওয়ার পরিমাণ বেড়েছে।

নুহাশ পল্লীতে প্রতিবছর আদার চাষ হয়। বর্ষার পরপর আদা কেটে কেটে লাগানো হয়। পাঁচ থেকে ছয় মাসে গাছ বড় হয়। যখন পাতা হলুদ হয়ে যায়, তখন মাটি খুঁড়ে আদা বের করা হয়। একেকটা আদা একেক রকম। দেখতে এত ভালো লাগে!

আদা গাছের পাতার স্বাদও যে অবিকল আদার মতো— এই তথ্য কি সবাই জানেন? আদার বদলে আদার পাতা দিয়ে গরুর মাংস অতি সুস্বাদু। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

আদায় কাঁচকলায় ব্যাপারটা কি জানেন? আদা এবং কাঁচকলা বিপরীতধর্মী। একটি রেচক অপরটি বিরেচক। দুই বিপরীতধর্মীকে একসঙ্গে করা যাবে না। শুনেছি কাঁচকলার তরকারিতে আদা দিলে কাঁচকলা সিদ্ধ হয় না। বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখার প্রয়োজন বোধ করি নি বলেই পরীক্ষা করা হয় নি।

কদম্ব

এসো করো স্নান
নবধারা জলে
এসো নীপবনে
ছায়াবীথি তলে।

নীপবন হলো কদম্ব বন। কদম্ব নিয়ে রবীন্দ্রনাথের আহ্লাদের সীমা ছিল না। 'বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল' তাঁর কাছে অন্য ব্যাপার। কদম ফুল বর্ষার আগমন বার্তার ফুল। প্রিয় তো হবেই।

কালিদাসের মেঘদূত কাব্যের একটি শ্লোক (পূর্বমেঘ)

"নিচে নামে গিরি সেখানে আছে
তার শিখরে বিশ্রামে নামবে
তোমার স্পর্শের পুলকে
ফোটাবে যে নব কদম্বের গুচ্ছ।"

(অনুবাদ : বুদ্ধদেব বসু)

শ্রী রাধিকার কৃষ্ণকে নিয়ে লীলাখেলার সবই কদম্ব গাছের নিচে। বলা হয়ে থাকে, কদম ফুলের হালকা সুবাস অদ্ভুত এক নেশা তৈরি করে। পুরুষ ও রমণী এই নেশায় একে অন্যের প্রতি অনেক বেশি আকর্ষণ বোধ করে।

আজকালকার তরুণ-তরুণীরা ফাস্টফুডের দোকানে সময় কাটাতে বেশি পছন্দ করে। তারা বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে কদম্ব তলে যেতে পারে।

বাংলাদেশের একজন ঔপন্যাসিকেরও কদম গাছ অতি প্রিয়। তিনি তাঁর নিভৃত নিবাসে একশ' কদমের চারা লাগিয়েছিলেন। তাঁর স্বপ্ন, ভরাবর্ষায় তিনি কদম্ববনে হাঁটবেন। দুঃখের ব্যাপার, অনেক চেষ্টা করেও তিনি কদম্ববন তৈরি করতে পারেন নি। চারটি গাছ শুধু শেষপর্যন্ত রক্ষা পেয়েছে। এরা বর্ষায় প্রচুর ফুল ফোটায়।

কদম্বের নামকরণে আসা যাক। কত্ শব্দের সঙ্গে অম্বচ প্রত্যয় যোগে হয়েছে কদম্ব (কত্+অম্বচ)। কত্ শব্দের অর্থ বিবশতা। যা বিবশতা আনে।

কদম ফুল চিবিয়ে নেশা করার প্রচলন আদিবাসীদের মধ্যে আছে। কদমের ছাল ছেঁচে খেলেও নাকি নেশা হয়। আমি এক বর্ষায় দু'টা কদম ফুল চিবিয়ে থু করে ফেলেছি। নেশা হয় নি, বমি হয়েছে।

কদম্বের বোটানিক্যাল নাম *AnthocePhauls indicus* A. Rich. এই গাছ Rubiaceae ফ্যামিলিভুক্ত। বিখ্যাত সিনকোনা (কুইনাইন) গাছও একই পরিবারভুক্ত। সিনকোনার ছাল যেমন জ্বরের উপশম করে, কদম্বের ছালও করে। নওয়াজেশ আহমেদের বইয়ে পড়লাম, মালয়েশিয়াতে জ্বরের উপশমে এখনো ব্যবহার করা হয়।

ভারতবর্ষে দু'প্রজাতির কদম্ব দেখা যায়। ধারা কদম্ব (*Anthocephauls indicus*) এবং কেলি কদম্ব (*Adina cordifolia*)।

আয়ুর্বেদাচার্য শিবকালী ভট্টাচার্য কদমের রসায়নে লিখেছেন— কদম্বে আছে দু'ধরনের অ্যাসিড Quinonic acid এবং Cinchotanic acid. এই সঙ্গে আছে Tannins. এরা কোথায় আছে ফলে না গাছে ? তিনি বলেন নি। আমিও তথ্য সংগ্রহ করতে পারি নি।

কদম ফল যে রান্না করে খাওয়া হয়— এই তথ্য কি জানেন ? আমি জানতাম না। নলিনীকান্ত চক্রবর্তী *ত্রিপুরার গাছপালায়* লিখেছেন, কদমের ফল রান্না করে খাওয়া হয়, তবে সহজে হজম হয় না। যারা বিচিত্র রান্নায় উৎসাহী, তারা রান্না করে দেখতে পারেন। হজমের দায়দায়িত্ব আপনাদের।

এখন আসি ভেষজ ব্যবহারে। বিভিন্ন ধরনের বইয়ে নানান ভেষজ ব্যবহারের উল্লেখ আছে। আমি শিবকালীর বইয়ের ভেষজ ব্যবহার প্রামাণ্য ধরে উল্লেখ করছি। তাঁর প্রতি ঋণ স্বীকার করেই এগুচ্ছি।

হাইড্রসিলি (অণ্ডকোষ বৃদ্ধি)

গাছের ছাল বেটে অণ্ডকোষে লাগিয়ে কদমপাতা দিয়ে বেঁধে রাখলে ব্যথা ও ফোলা দুইই কমবে।

টিউমার বা অর্বুদে

কচি ছাল চন্দনের মতো বেটে লাগাতে হবে। লাগানোর আগে গরম করে নেয়া ভালো।

ক্রিমিতে

কদমপাতার রস খাওয়ালে শিশুদের ক্রিমি বের হয়ে যায়। গ্রাম-বাংলায় এটি বহুল প্রচলিত চিকিৎসা। শিবকালি বলছেন, তিনি নিজে দেখেছেন এই চিকিৎসায় Round Worm-এর সঙ্গে সুতা ক্রিমি (Thread worm)-ও বের হতে।

স্টোমাটাইটিসে

শিশুদের মুখের ঘায়ে কদম পাতা সেদ্ধ পানি দিয়ে কুলকুচা করাতে হবে।

আমার মতে, কদমের সবচেয়ে বড় ভেষজ গুণ মন ভালো করে দেয়ার অদ্ভুত ক্ষমতা। পূর্ণ বর্ষায় এই গাছের নিচে দাঁড়ালে মনে হয়— আহারে! বেঁচে থাকাই আনন্দের। এই গাছের রোগ সারাবার কোনো প্রয়োজন নেই। সে তার সৌন্দর্য নিয়েই ঝলমল করুক।

একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। বর্ষা ছাড়াও কিন্তু কদম ফুল ফোটে। শরতে ফোটে। এমনকি শীতকালেও ফোটে। এক শীতে আমার সাংবাদিক বন্ধু সালেহ চৌধুরী আমাকে একগুচ্ছ কদম উপহার দিয়ে চমকে দিয়েছিলেন।

গাঁজা

পশ্চিমবঙ্গের এক বিখ্যাত ঔপন্যাসিক নুহাশ পল্লীতে বেড়াতে এসেছিলেন। তিনি নুহাশ পল্লীর ওষধি বাগান দেখে এক পর্যায়ে জানতে চাইলেন, গাঁজার গাছ আছে কি-না ? আমার মন খারাপ হলো এই ভেবে যে এত গাছ জোগাড় করেছি, গাঁজার গাছ জোগাড় করতে পারি নি! এর পর যাকেই পাই তাকেই বলি, একটা গাঁজার গাছ জোগাড় করে দিতে পারেন ? যাকে বলা হয় তিনি কেমন করে যেন তাকান। তাঁকে দোষ দিতে পারি না— কেমন কেমন করে তাকাবারই কথা। গাঁজা নিয়ে রয়েছে বিখ্যাত লোকজ গান—

'গাঁজার নৌকা শূন্যের ভরে যায়'

অর্থ গঞ্জিকাসেবীর নৌকা পানিতে চলে না, শূন্যে উড়াল দিয়ে চলে।

শিবের প্রিয় বস্তু গাঁজা এবং ভাং। বর্তমানের অনেক তরুণ-তরুণী শিবের পথ ধরেছেন, গাঁজা খাচ্ছেন। তবে তাদের আদর্শ শিব না— পশ্চিমা দেশগুলির তরুণ-তরুণী। যেহেতু তারা Grass খাচ্ছে, কাজেই আমাদেরও খেতে হবে।

বছর পনেরো আগে আমি সুসং দুর্গাপুর গিয়েছিলাম। সন্ধ্যা মেলাবার বেশ অনেকক্ষণ পর শাঁখের আওয়াজ হতে লাগল। থেমে থেমে শাঁখের আওয়াজ। আমাকে বলা হলো, গাঁজা খাওয়ার জন্যে ডাকছে। গঞ্জিকাসেবীরা এই আওয়াজ শুনে একত্রিত হবেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই আনন্দময় ভুবনে (!) প্রবেশ করবেন। কাছে গিয়ে দৃশ্যটা দেখার শখ ছিল। আমাকে বলা হলো, কাছে গেলেই খেতে হবে।

গাছটির বোটানিক্যাল নাম *Canabis sativa* Linn. গোত্র Urticaceae. শুভ সংবাদ হচ্ছে, এই গোত্রের আর কোনো গাছেরই মাদক গুণ নেই।

গাঁজা গাছের স্ত্রী-পুরুষ আছে। দুই ধরনের গাছেই ফুল হয়। তবে শুধু স্ত্রী গাছই গাঁজা, ভাং এবং চরস দেয়। পুরুষ গাছের মাদক ক্ষমতা নেই। ধিক পুরুষ গাঁজা বৃক্ষ!

স্ত্রী গাছের শুকানো পাতাকে বলে সিদ্ধি বা ভাং। কালীপূজায় ভাং-এর শরবত অতি আবশ্যকীয় বস্তু। ভাং-এর শরবত কী করে বানাতে হয় সেই রেসিপি জোগাড় করেছি। সংগত কারণেই দিচ্ছি না। এই শরবত ভয়ঙ্কর হেলুসিনেটিং ড্রাগ। ট্রাকের পেছনে যেমন লেখা থাকে ১০১ হাত দূরে থাকুন, ভাং-এর শরবত

থেকে ১০১ মাইল দূরে থাকা বাঞ্ছনীয়।

স্ত্রী গাঁজা গাছের পুষ্পমঞ্জুরী থেকে তৈরি হয় গাঁজা। খুব কঠিন প্রস্তুতিপর্ব না। রোদে শুকিয়ে নিলেই হলো। স্ত্রী গাছের কাণ্ড, পাতা এবং ফুল থেকে আঠালো যে নির্যাস বের হয় তা জমিয়ে তৈরি হয় চরস। শুনেছি চরস খেতে হয় ময়লা দুর্গন্ধময় কাঁথা বা কম্বল গায়ে জড়িয়ে। কাঁথা কম্বল যত নোংরা হবে, নেশা নাকি ততই জমবে।

রসায়ন— গাঁজা গাছের ফুল, ফল, পাতা এবং এর গা থেকে বের হওয়া নির্যাসে আছে সত্তরেরও বেশি ক্যানাবিনয়েডস ; এদের মধ্যে প্রধান ক্যানাবিনল, ক্যানাবিডিওল, ক্যানাবিনিন। এছাড়াও আছে নানান ধরনের Alhaloids (নাইট্রজেন ঘটিত যৌগ) এবং কোলিন ট্রাইনেলিন। এইসব জটিল যৌগের কারণেই গাঁজা, ভাং এবং চরসসেবীদের ভেতর তৈরি হয় অবসাদ, নেশা এবং বিভ্রম। দীর্ঘ ব্যবহারে ব্রেইনের বারোটা বেজে যায়। নানান ধরনের স্নায়ুবিক রোগ দেখা দেয়। যে বস্তু শিব এবং নন্দি ভৃঙ্গি হজম করে, সেই বস্তু আমরা হজম করব কীভাবে ?

এখন দেখা যাক গাঁজা গাছের ভেষজ দিক। প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে চীন সম্রাট সেন নুং গাঁজা গাছের ওষধি গুণ প্রথম আবিষ্কার করেন (সূত্র Internet, নওয়াজেশ আহমেদ, *বাংলার বনফুল*)। প্রাচীন ভারতীয় আয়ুর্বেদশাস্ত্রে এর ওষধি গুণ নিয়ে তেমন কিছু পাওয়া যায় নি। শিবকালী ভট্টাচার্য লিখছেন— "চরসের চিকিৎসা স্থানের প্রথম অধ্যায়ে এবং সুশ্রুতের চিকিৎসাস্থানের ২৯ অধ্যায়ে সোমবল্লরীর উল্লেখ থাকলেও এটা যে সিদ্ধি বা ভাং এটাকে উপস্থাপিত করা যায় না।"

তথ্যকথা বাদ থাকুক। আমরা বরং এই নিষিদ্ধ গাছের ভেষজ প্রয়োগ দেখি।

গাঁজার ভেষজগুণ কোনো শ্রুতিতে নেই, তবে ভারতবর্ষে এর ভেষজ ব্যবহার অনেকদিন থেকেই আছে। গাঁজা হচ্ছে ত্রিমূর্তি ভেষজ। সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোর মিলিত রূপ।

পাঠক যদি প্রশ্ন করে বসেন— সত্ত্ব, রজঃ, তমোর ব্যাখ্যা কী ? আমি নাচার। ব্যাখ্যা করতে পারব না। আপনাদের যেতে হবে বেদাচার্যের কাছে।

গাঁজার ঔষধি ব্যবহার

- অর্শরোগের রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে হলে দুধের সঙ্গে বেটে প্রলেপ দিতে হবে।
- প্রাচীনকালে গনোরিয়াতে গাঁজার ব্যবহার হতো। দুধের সঙ্গে বেটে ক্ষতে লাগানো হতো।

- অতি আধুনিক কালে ইউরোপের হাসপাতালে ক্যান্সারের প্রচণ্ড ব্যথা কমানোয় গাঁজার ধোঁয়া পান করতে দেয়া হয়।

সিদ্ধির ঔষধি ব্যবহার

গাঁজার পাতারই আরেক নাম সিদ্ধি কিংবা ভাং। মহাপুরুষরা সিদ্ধি লাভের জন্যে এই বস্তু ব্যবহার করতেন। মহাপুরুষ হবার সহজ পথ (!) বাঁধা থাকুক। সিদ্ধির পাতা শোধনের নিয়ম বলি। দুধের সঙ্গে মিশিয়ে জ্বাল দিতে হবে। দুধ যখন হালকা সবুজ বর্ণ ধারণ করবে, তখন দুধ ফেলে দিয়ে সিদ্ধি পাতা সংগ্রহ করতে হবে। সেই পাতা ভালোমতো পানিতে ধুয়ে শুকিয়ে সামান্য ঘিতে ভেজে বোতলে ভরে রেখে দিতে হবে। তৈরি হয়ে গেল ভেষজ গুণসম্পন্ন সিদ্ধি।

শিশুদের তড়কা রোগে খিঁচুনিতে তাৎক্ষণিকভাবে ক্রিয়া করে। দুঃখিত, মাত্রা জানি না।

হাঁপানিতে, Hay fever-এ দারুণ কার্যকর। হৃদযন্ত্রের সমস্যায়ও এর ব্যবহার আছে।

কামউত্তেজক হিসেবে সিদ্ধির ভালো নামডাক আছে। রাজা-মহারাজাদের বহু নারীর কাছে সান্ত্বনা পাবার জন্যে যেতে হতো। তাদের জন্যে বিশেষভাবে ঘিয়ে ভাজা সিদ্ধি তৈরি করে দিতে হতো।

আমরা যেহেতু আমজনতা, রাজাবাদশা নই, সিদ্ধির এই অপূর্ব (!) ভেষজগুণের বিষয়ে আমাদের না জানলেও চলবে। আমাদের জন্যে রবীন্দ্রনাথই ভালো।

দেখব শুধু মুখখানি
শুনব যদি শুনাও বাণী।
না হয় যাব অনাদরে...
ইত্যাদি ইত্যাদি।

বেল

বেলগাছে ভূত থাকে এই তথ্য নিশ্চয় জানেন ? সব ধরনের ভূত না। ভূত সমাজের শ্রেষ্ঠরা। ব্রাহ্মণ ভূত, যার আরেক নাম ব্রহ্মদত্যি। উচ্চশ্রেণীর ভূতরা বেলগাছে থাকবেন এটাই তো স্বাভাবিক। কারণ বেল হিন্দুদের কাছে অতি পবিত্র বৃক্ষ। বেলের তিন পাতা হচ্ছে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের প্রতীক। শিবের ত্রিনয়নের প্রতীক। সত্ত্ব, রজ এবং তম গুণের প্রতীক। জাগ্রত, সুষুপ্তি এবং স্বপ্নের প্রতীক। বেলপাতা ছাড়া শিবপূজা হবে না। দুর্গাপূজার আদিবাস এবং বোধন দুইই হয় বেলগাছে। বচনই তো আছে—

'আসছে দুর্গাপূজা
বেলপাতা চাই বোঝা বোঝা।'

হিন্দু ছাত্রদের বই খুললেই পাওয়া যাবে বেলপাতা। কারণ এই পাতা দেবী সরস্বতীরও পছন্দ। সরস্বতী পূজায় বইয়ের ভেতর বেলপাতা দিয়ে সেই বই দেবীর পায়ের কাছে রাখলে দেবী বিদ্যা দেন।

বেল Rutaceae পরিবারের গাছ। বৈজ্ঞানিক নাম *Aegle marmelos.*

বেলের রসায়ন— বেলে আছে জটিল কিছু Alraloids (নাইট্রোজেন ঘটিত যৌগ) যেমন Haplopine, Aegeline, Tambanide, ditamine ইত্যাদি। আরো আছে Coumarins যেমন— 6, 7- dimethoxy coumarin, scopoletin, Kanthotoxin, Marmin, Marmasin ইত্যাদি। Sterol আছে দুই ধরনের, Betasitosterol এবং Gamasitosterol. এইখানেই শেষ না, আরো কিছু জটিল যৌগ আছে যার একটি হলো lupeol.

বেল অতি পরিচিত ফল। প্রধান ব্যবহার শরবত তৈরিতে। পাকা বেলের শরবতের রেসিপি সবার জানা। আমি কাঁচা বেলের শরবতের একটা রেসিপি দিচ্ছি। কারণ প্রাচীন ভেষজবিদরা পাকা বেলকে বিষবৎ পরিত্যাগ করে কাঁচাবেলকে অমৃতসম গ্রহণ করতে বলেছেন।

সংহিতায় বলা হচ্ছে—

'পক্কং বিল্বং বিষোপমম, আমং তুং অমৃতোপমম'

এখানে কাঁচাবেলের শরবতের রেসিপি। রেসিপি দিয়েছেন হেকিম মাওলানা মোঃ মোস্তফা (তিব্বিয়া হাবিবিয়া ইউনানী কলেজ, ঢাকা)।

কাঁচাবেলের শরবত

কাঁচা বেল কুটে আধসের পানিতে সেদ্ধ করে এক পোয়া হলে নামিয়ে ছেঁকে নিয়ে তাতে মিছরি মেশান এবং জ্বাল দিন। পরে ঠান্ডা করে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে পান করুন।

পাকাবেলের শরবত এ দেশের অনেক মানুষ খুবই আগ্রহের সঙ্গে খান। তাদের কাছে বেলের নানান গুনাগুণের কথা শোনা যায়। প্রাচীন ভেষজ বিজ্ঞান এই কথা বলে না। তাদের সকল প্রশংসা কাঁচাবেলের।

বেলের স্থান হয়েছে ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়ায়। বাংলাদেশ জাতীয় আয়ুর্বেদিক ফর্মুলারীতে ১৯৯২ ৩৮টি ঔষুধের উপাদান হিসেবে বেলের বিভিন্ন অংশের ব্যবহার রয়েছে। ১৯টিতে বেলশুঁঠ, ১টিতে বেলপাতা, ১৭টিতে মূল এবং ১টিতে বেল ছাল ব্যবহার করা হয়েছে। (সূত্র : *ঔষধি উদ্ভিদ*, ডাঃ সামসুদ্দিন আহমেদ)।

আধুনিক বিজ্ঞান বলছে কাঁচা বেল ফল রানীক্ষেত রোগের ভয়ঙ্কর ভাইরাস ধ্বংস করার ক্ষমতা রাখে। মনে রাখতে হবে ভাইরাসের বিরুদ্ধে আমাদের কোনো অস্ত্র নেই।

বেলের রয়েছে হাইপোগ্লাইসেমিক ক্ষমতা। অর্থাৎ রক্তে চিনির পরিমাণ কমানোর ক্ষমতা। অন্ত্রনালির পরজীবী নষ্ট করার ক্ষমতা।

ব্যক্তিগতভাবে বেল আমার পছন্দের ফল না। কাঁচাবেল খাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। ছোটবেলায় আগুনে পুড়িয়ে কাঁচাবেল খেয়েছি এই স্মৃতি আছে। খেয়ে মহা আনন্দ পেয়েছি এমন স্মৃতি নেই। তবে গাজীপুরে বিশাল আকৃতির কিছু বেল পাওয়া যায়, যার স্বাদ এবং গন্ধ তুলনাহীন।

এবার ভেষজ ব্যবহারের দিকে যাওয়া যাক।

ঘামের দুর্গন্ধ দূরে

মোটা মানুষরা প্রচুর ঘামেন। তারা যদি বেল পাতার রস পানিতে মিশিয়ে গায়ে মাখেন, তাহলে দুর্গন্ধ দোষ কাটবে। পরীক্ষিত।

সর্দি জ্বর

ভারতের পশ্চিম অঞ্চলের টোটকা চিকিৎসা। এক চামচ পাতার রস খেলে সর্দি, জ্বর এবং জ্বরভাবের সমাপ্তি।

শোথ রোগ

হাত-পা ফুলে গেলে বেল-পাতার রস মধু দিয়ে খাওয়ার বিধান অতি প্রাচীন চিকিৎসা ব্যবস্থা।

আন্ত্রিক ক্ষত রোগ (আলসার)

বেলশুঁঠ বার্লির সঙ্গে মিশিয়ে সেদ্ধ করে খেলে আন্ত্রিক ক্ষত সারে।

অনিদ্রা এবং ডিপ্রেসন

বেলের মূলের ছালচূর্ণ দুধের সঙ্গে মিশিয়ে খেলে অনিদ্রা রোগ সারে এবং উদাসীন ভাব দূর হয়।

বেলপাতার একটি বিশেষ ব্যবহার আগে বলেছি— পাঠ্যবইয়ে বেলপাতা রেখে দিলে বিদ্যা অর্জন হয়। জ্ঞান হয়।

আধিভৌতিক এই বিষয়ের সাধারণ ফর্মুলাও আছে। প্রতিদিন তিনটা বেলপাতা ঘিয়ে ভেজে খেলে স্মৃতিশক্তি ও মেধা বাড়ে। এটা না-কি পরীক্ষিত। আমি পরীক্ষাটা করি নি। স্মৃতিশক্তি ও মেধা যা আছে তাতেই খুশি আছি। তবে ইদানীং পুরনো বন্ধুদের নাম ভুলে যাচ্ছি। ঘিয়ে ভাজা বেলপাতা খেয়ে দেখতে হবে, নাম মনে পড়ে কি-না।

পান

বিয়েবাড়িতে বিপুল খাওয়া-দাওয়া হয়েছে। পোলাও, রোস্ট, খাসির রেজালা, সবশেষে দৈ-মিষ্টি। পানের খিলি সাজানো আছে। সর্বশেষ আইটেম একটা আস্ত মিষ্টি পান মুখে দিয়ে 'বিয়েবাড়ির খাওয়ার আয়োজন সুবিধার হয় নি' এই নিয়ে আলোচনা।

বিয়েবাড়িতে আস্ত পানের খিলি আমরা অনেকদিন থেকেই খাচ্ছি। কেউ নিষেধ করছে না। প্রাচীন আয়ুর্বেদশাস্ত্রীরা আশেপাশে থাকলে সমস্যা হতো। তারা তেড়ে আসতেন— 'করছ কী! করছ কী! পানের মধ্যম শিরা খেয়ে ফেলছ? মধ্যম শিরা বিষবৎ পরিত্যাজ্য।'

একটা পান পাতা হাতে নিয়ে দেখুন। এর আছে সাতটা শিরা। আয়ুর্বেদ বলছে, মধ্যম শিরা বিষ। যেহেতু বিষের কাছেই থাকে অমৃত, বাকিটা অমৃত। সাতটা শিরার কারণে পানের আরেক নাম 'সপ্তশিরা'। মধ্যম শিরার বিষয়টি গ্রামবাংলায় এখনো মানা হয়। গ্রামের ললনাদের দেখেছি, অতি যত্নে পান থেকে মধ্যম শিরা আলাদা করেন।

পান আমাদের সংস্কৃতির অঙ্গ। প্রাচীন বইপত্র থেকে জানা যাচ্ছে, সাড়ে তিন হাজার বছর ধরে আমরা এই বস্তু চিবাচ্ছি। সাধারণ মানুষরা যেমন চিবাচ্ছে, রাজা-বাদশারাও চিবাচ্ছেন। মেটিয়াবুরুজ দুর্গে বন্দি অবস্থায়ও নওয়াব ওয়াজেদ আলি খান পান খেতেন, মুক্তা গুঁড়া এবং কস্তুরী দিয়ে। আমজনতার জন্যে অবশ্যি পানের সঙ্গে সুপারি এবং চুনই যথেষ্ট।

পানের অদ্ভুত সব ব্যবহার আমি নিজের চোখে দেখেছি। এর একটা বলি, নাগরিক পাঠকরা মজা পাবেন। 'নজর লাগা' বলে একটি বিষয় প্রচলিত আছে। নবজাতকের উপর যদি নজর লাগে, সে চিৎকার করে কাঁদবে। খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দেবে। তখন তার 'ডিট' পোড়াতে হবে। কাজটা করা হবে দু'টা পান পাতা দিয়ে। সরিষার তেল মাখিয়ে পান পাতা দু'টা শিশুর মাথা থেকে পা পর্যন্ত টানতে হবে এবং টানার সময় যাদের নজর লেগেছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে, তাদের নাম বলতে হবে। এরপর পান পাতা আগুনে পোড়াতে হবে। যদি ঠাশঠাশ শব্দ হয় তাহলে বুঝতে হবে, নজর লেগেছিল, এখন নজর কাটল।

শিশুদের পেট ফাঁপায় পানের বোঁটার ব্যবহার বাংলাদেশের সব মা-ই জানেন বলে আমার ধারণা। কয়েকদিন আগে আমার কনিষ্ঠ পুত্র নিষাদ পান বোঁটা চিকিৎসার ভেতর দিয়ে গেছে। আমি খুব কাছ থেকে এই চিকিৎসা পদ্ধতি দেখে চমৎকৃত হয়েছি।

পানের রসায়ন বিষয়ে বলি। পান পাতায় আছে অ্যালকালয়েড আরাকিন, ট্যানিল, ইওজেনস, ট্যানিল ও ডায়াসাটস। এই সঙ্গে সামান্য বিটা ক্যারোটিন। ফিনোলিক কম্পাউন্ড Chavicol, Hydroxy Chavicol'ও পান পাতায় আছে।

পান Piperaceae পরিবারভুক্ত। বোটানিক্যাল নাম *Piper betle* Linn.

ব্যবহার

- মাথার উকুনে : পানের রস মাথায় মাখলে উকুনের উৎপাত শেষ। একবেলা মাখলেই হবে।
- নখকুনি রোগ : নখের কোণ বড় হয়ে যাওয়া রোগের নাম নখকুনি। পানের রস গরম করে দিনে কয়েক দফা নখের কোণে দিলে নখকুনি রোগ সারে। নখের বৃদ্ধিও কমে।
- দাদ : পানের রস ঘষে কয়েকদিন মাখলেই আরোগ্য লাভ হয়।
- ফোঁড়া : পানের সোজা পিঠে ঘি মাখিয়ে ফোঁড়ায় বসালে ফোঁড়া পাকে। ফোঁড়া পাকার পর উল্টো পিঠ ফোঁড়ায় বসালে পুঁজ বের হয়ে আসে। পানের অ্যান্টিসেপটিক গুণ আছে বলে ফোঁড়া বিষাক্ত হতে পারে না।

পানের শিকড়ের একটা ব্যবহারের কথা বলে পান-বিষয়ক আলোচনা শেষ করি। পানের শিকড় মেয়েদের বেটে খাওয়ালে না-কি আর গর্ভ সঞ্চার হয় না। বইপত্রে দেখেছি এটা না-কি পরীক্ষিত। ভয়াবহ এই পরীক্ষা কীভাবে করা হলো, কেন করা হলো, কে জানে! *Glossary of Indian Medicinal Plants*-এ এই বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।

কাঁকড়ার চোখ

নীল রঙের নিসিন্দা

সাদা বাসক

কলকে বা সৌভাগ্য বাদাম বৃক্ষ

কৃষ্ণবট

আদা

পান

অগুরু বা অগর

তেঁতুল

কদম্ব

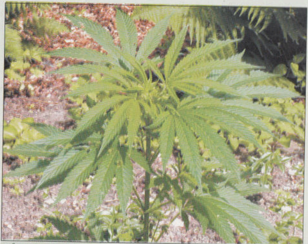

গাঁজা

বাসক

'চারিদিকে বাংলার ধানি শাড়ি— শাদা শাঁখা বাংলার মাস
আকন্দ বাসকলতা ঘেরা এক নীলমঠ আপনার মনে
ভাঙিতেছে ধীরে ধীরে : চারিদিকে এইসব আশ্চর্য উচ্ছ্বাস—'
জীবনানন্দ দাশ

কবি কি ভুল করে বাসকলতা লিখলেন ? না-কি ছন্দ মেলানোর জন্যে 'লতা' যুক্ত করেছেন ? আকন্দ লতানো গাছ হলেও বাসক না। বাসক বহুবর্ষজীবী গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ। একসময় গ্রামবাংলার ঘরে ঘরে বাসক এবং তুলসি গাছ দেখা যেত। এখনো হিন্দুবাড়িতে তুলসি গাছ দেখা যায়, তবে বাসক না।

অর্থবেদের ব্যাখ্যাকার মহীধর বাসককে বলেছেন অট রূষক। অট রূষক হলো, শরীরের দোষকে (রোগ) হিংসা করে। চরকের টীকায় চক্রদত্ত বলেছেন—

বাসায়াং বিদ্যমানায়া মাশায়ং জীবিতস্য চ।
রক্তপিত্তী ক্ষয়ি কাশি কিমর্থমবকসদ্‌তি।।

অর্থ হচ্ছে, বাসক যদি থাকে তাহলে ক্ষয়রোগ ও কাশরোগে মৃত্যুচিন্তায় অস্থির হবে কেন ?

বাসকের বোটানিক্যাল নাম *Adhatoda vasica* Nees. এর ইংরেজি নাম Malabur Nut, আরবি নাম ইশীশতু সুআল, ফরাসি নাম রব্বাজা (সূত্র : *ওষুধি উদ্ভিদ*, ড. সামসুদ্দিন আহমেদ)। বাসকের আরবি, ফরাসি এবং ইংরেজি নাম প্রমাণ করে বাংলার এই উদ্ভিদের পরিচিতি ব্যাপক।

এদেশে বাসকের প্রধান ব্যবহার কাশিতে। প্রচণ্ড কাশি হয়েছে, বুকে কফ জমেছে, মনে হচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিক খেতে হবে, তখন বাসক পাতার রস খেয়ে দেখা যেতে পারে। বাসক পাতার রস যে অতিদ্রুত কাশি দূর করে তার প্রমাণ আমি নিজে। যতবার কাশি হয়েছে পাতার রস খেয়ে সুস্থ। সমস্যা একটাই, ডোজের সমস্যা।

একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ কতটুকু রস খাবেন ? একটা শিশুইবা কতটা খাবে ? আয়ুর্বেদে 'ডোজের' বিষয়টা অনুপস্থিত বললেই হয়। ব্যাপক গবেষণা করে 'ডোজে'র বিষয়টা ঠিক করা উচিত না ? দু'হাজার বছর আগের পুরনো পুঁথি দেখে

চলাটা কি এই যুগে যুক্তিযুক্ত? বাসকের অ্যাকটিভ ইনগ্রেডিয়েন্টও তো খুঁজে বের করা প্রয়োজন।

বাসকের রসায়নে দেখি Vasicine, I-Peganine এবং কিছু essential oil, এর কোনটা অ্যাকটিভ ইনগ্রেডিয়েন্ট?

বাসক পাতার প্রচণ্ড জীবাণু বিধ্বংসী ক্ষমতা আছে। এটা পরীক্ষিত। কয়েকটা পাতা ছিঁড়ে কলসির পানিতে ছিটিয়ে দিলে কলসির পানি জীবাণুমুক্ত হবে। এখানেই বা অ্যাকটিভ ইনগ্রেডিয়েন্ট কী?

তিন ধরনের বাসক গাছের উল্লেখ দেখা যায়। সাদা বাসক, আম্রপুষ্পি বাসক এবং রক্তপুষ্পি বাসক। আম্রপুষ্পি বাসক এবং রক্তপুষ্পি বাসক অতি দুর্লভ বলেই হয়তো এদের ভেষজ গুণ সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না।

নুহাশ পল্লীতে সাদা বাসক ছাড়াও আছে কালো বাসক। ফুল গাঢ় নীল, প্রায় কালচে। এই বাসকের উল্লেখ কোথাও পাই নি। বাসক ফুল যে নীল হয় আমি জানতাম না।

এখন আসুন ঔষধি ব্যবহারে।

গাত্রবর্ণ ফর্সা করা প্রয়োজন? শঙ্খ ভস্মের সঙ্গে বাসক পাতার রস মিশিয়ে গোসলের তিনঘণ্টা আগে গায়ে মাখুন। এক সপ্তাহেই কাজ হবে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

খোসপাচড়া : গরুর প্রস্রাবের সঙ্গে বাসক পাতা বেঁটে লাগালে নিশ্চিত নিরাময়! (সূত্র : *চিরঞ্জীব বনৌষধি*, শিবকালী)

হাঁপানিতে : বাসকের পাতা শুকিয়ে সিগারেট বানিয়ে টানলে হাঁপানির আরাম।

অর্শরোগে : বাসক পাতা থেঁতো করে (অল্প গরম করে) ন্যাকরায় পুঁটলি বেঁধে মলদ্বারে সেঁক দিলে যন্ত্রণা ও ফোলা দুইই কমবে।

বেঁচে থাকুক আমাদের চিরচেনা বাসক।

অগুরু / অগর

নুহাশ পল্লীতে গোটা বিশেক অগুরু গাছ আছে। সিলেট চা-বাগানে আমার এক প্রিয়জন আরজু থাকে। তার কাজ হচ্ছে খুঁজে খুঁজে দুর্লভ গাছ জোগাড় করে পাঠানো। অগুরু সেই অর্থে দুর্লভ না। সিলেট অঞ্চলে প্রচুর জন্মায়। অগুরু কাঠ পাতন করে সিলেট অঞ্চলে সুগন্ধি বের করা হয়।

আরজু অগুরু গাছ পাঠিয়েছে ঔষধি গাছ হিসেবে না। অর্থনৈতিক বিবেচনায়। সে অতি উৎসাহে বলেছে, 'এক একটা গাছ আপনে লাখ টেকায় বেচবেন।'

লক্ষ টাকায় গাছ বিক্রির আমার কোনো শখ নেই। ঔষধি গাছ সংরক্ষণের শখ। সর্ব অর্থেই অগুরু ঔষধি গাছ। অগুরুর শাব্দিক অর্থ যার গুরু নেই। সংহিতায় বলা হয়েছে, 'বনভূমিতে তুমি সব বিচারেই গুরু, তাই তুমি অগুরু।'

অগুরু হচ্ছে সেই গাছ যার বাকলে লেখা হতো। বাকল পাতলা কিন্তু শক্ত। আরবে এই বৃক্ষ জন্মে কিনা জানি না, কিন্তু তাদের কাছে এই বৃক্ষের কদর আছে। আরবিতে অগুরু গাছকে বলে উদ। বোটানিক্যাল নাম *Aquilaria malaccensis* Lamk. *Thymeleaceae* পরিবারভুক্ত।

পাতন প্রক্রিয়ায় অগুরু থেকে যে তেল পাওয়া যায় তাতে আছে সেলিনিন, এগারুন এবং বেশকিছু কিটোন। গাছের ভেতরে তেল তৈরির জন্যে গাছকে কিন্তু নানানভাবে কষ্ট দেয়া হয়। গোড়া থেকে গাছের কাণ্ডে প্রচুর পেরেক পুঁতে দেয়া হয়। গাছ কষ্টের ভেতর দিয়ে যায়, ছত্রাকের আক্রমণে পর্যদুস্ত হয়। তখনই নাকি গাছ সুগন্ধি তৈরি করে। নুহাশ পল্লীর কোনো অগুরু গাছে আমি পেরেক পুঁততে দেই নি। সুগন্ধি তেলের আমার প্রয়োজন নেই। ভালো কথা, একটা তথ্য দিতে ভুলে গেছি। সব কাঠ পানিতে ভাসে। অগুরু কাঠ ভাসে না। পানিতে ডুবে যায়।

ঔষধি ব্যবহার

- 'মেদ ভুঁড়ি কী করি' ওয়ালাদের জন্যে সুসংবাদ। অগুরু কাঠ চন্দনের মতো ঘষে ১ চা-চামচ করে খেলে মেদ রোগ সারে।
- গরম পানিতে এক কাপে এক চামচ অগুরুর পাউডার খেলে হাঁপানি রোগ সারে। শুধু হাঁপানি না, পাণ্ডুরোগেও (রক্তশূন্যতা) এটি মহৌষধ।
- অগুরু পাউডার গায়ে মাখলে চুলকানি এবং ছুলি রোগের আরাম হয়।

- বাংলাদেশ জাতীয় আয়ুর্বেদ ফর্মুলারি ১৯৯২-তে যেসব অসুখে অগুরুর ব্যবহার দেখানো হয়েছে তা হলো, মেদরোগ, মুখে দুর্গন্ধ, হৃদরোগ, পাণ্ডু, প্রমেহ, কুষ্ঠ, বাত, ধ্বজভঙ্গ, শুক্রদোষ ইত্যাদি (সূত্র : ঔষধি উদ্ভিদ; ড. সামসুদ্দিন আহমদ।)
- চীনা ভেষজে অগুরু কাঠকে বিবেচনা করা হয় কামউত্তেজক হিসেবে।

কলকে / সৌভাগ্য বাদাম বৃক্ষ

'ওয়েস্ট ইন্ডিজ' নাম শুনলেই মনে আসে ক্রিকেটের কথা। মনে হয় অপূর্ব সুন্দর দ্বীপের দেশে ক্রিকেট খেলা হচ্ছে। সেইসব দ্বীপে অপূর্ব একটি বৃক্ষ আছে, যার নাম Lucky nut tree, সাদা বাংলায় সৌভাগ্য বাদাম বৃক্ষ।

সৌভাগ্য বাদাম বৃক্ষের বীজ ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে এসেছে বাংলায়। বৃক্ষের নতুন নাম হয়েছে কলকে। কারণ ফুলটা দেখতে আমাদের দেশের কল্কির মতো। হলুদ বর্ণের চমৎকার ফুল ফোটে। ফুলের নাম কলকে ফুল।

অতি দূরের এই গাছ এদেশে কী করে চলে এল তা নিয়ে গবেষকরা নানান কথা বলেন। এক দল বলেন, জলদস্যুরা এনেছে। এই তথ্য আমার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয় না। জলদস্যুরা এসেছে ডাকাতি করতে। নিজ দেশের ফুলের বীজ দেশে দেশে ছড়ানোর মহান দায়িত্ব তাদের ছিল না।

আরেক দল গবেষক বলছেন, এই ফুলের বীজ খ্রিষ্টান পাদ্রীরা এনেছেন। তারা গির্জার চারপাশে এই বীজের গাছ তৈরি করে শোভা বর্ধনের চেষ্টা করেছেন। এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য।

অতি দূর দেশের এই গাছের গোত্রেরই কিছু প্রজাতি কিন্তু ভারতবর্ষেই ছিল। তাদের সংস্কৃত নাম করবীরক। বাংলায় করবী। বেদ, চরক, সুশ্রুত, নিঘুন্টি গ্রন্থাদিতে করবীর উল্লেখ আছে। রাজ নিঘুন্টিতে চার রকমের করবীর কথা বলা হয়েছে— শ্বেত-রক্ত-পীত-কৃষ্ণ। নুহাশ পল্লীতে রক্তকরবী এবং পীতকরবী আছে। বাকি দু'টি নেই। কোথাও আছে এমন শুনি নি।

কলকে প্রসঙ্গে ফিরে আসি। এর বোটানিক্যাল নাম *Thevetia peruviana* Merr. গোত্র Apocynaceae.

কলকে বা পীত করবীর রসায়নে যাওয়া যাক। এর ছালে আছে Glycosides এবং lupeol acetate ।

মূলেও আছে Glycosides. তবে এই glycosides, ছালের glycosides না।

ফুলে আছে Glycosides of qvercetin-4-methyl ethen.

পাতায় আছে α-amyrin, β-amyrin এবং cardiac glycosides.

কলকের বীজে আছে কিছু ফ্যাটি অ্যাসিড যেমন, linoleic 6.3%, palmitic

17.1%, stearic 11.8%, arachidic 0.4%, olic 64.3% এবং কিছু Glycosides.

বাংলার মেয়েরা কলকে ফুলের বীজ চেনে। তাদের জীবন যখন শুকায়ে যায়, তারা আশ্রয় নেয় কল্কের বীজের কাছে। বিষাক্ত এই বীজ প্রাণ হন্তারক। অনেক দুখিনী পল্লীবালা কল্কের বীজ খেয়ে দুঃখ জুড়িয়েছে।

যাক দুঃখকথা। এর ভেষজ গুণ কী আছে দেখা যাক।

- মূলের ছাল : জ্বর কমায়। গায়ে মাখলে চর্ম রোগ দূর হয়। অর্বুদে (টিউমার) কাজ করে। তবে মনে রাখতে হবে, ছালও বীজের মতোই বিষাক্ত।
- পাতা : বিরেচক এবং বমনকারক। মাত্রা ছাড়িয়ে গেলেই বিষাক্ত।
- ফল এবং বীজ : তীব্র বিষ। অল্প মাত্রায় গর্ভস্রাবকারক, বাত রোগ নাশক।
- ফুল : হৃৎপিণ্ডের বল কারক। ফুলের মধু খেতে ভালো এবং শরীর বল কারক।

এই গাছের যত ঔষধি গুণই থাকুক, এর থেকে একশ হাত দূরে থাকাই বাঞ্ছনীয়। তারপরেও এই গাছকে সৌভাগ্য গাছ কেন বলা হয় কে জানে! দক্ষিণ আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ানরা বিশ্বাস করে, ভোরবেলা ঘুম ভেঙেই কলকে গাছের ফুল এবং ফল দেখা মহাসৌভাগ্যের ব্যাপার। তাদের ঘরের জানালার কাছে এই গাছ থাকবেই। জানালা খুললেই দেখা পাওয়া যাবে সৌভাগ্যের।

তেঁতুল

'টকের ভয়ে ঘর ছাড়লাম তেঁতুল তলে বাস'। সুন্দর প্রবচন না?

তেঁতুল আমাদের সংস্কৃতির অংশ অতি প্রাচীনকাল থেকেই। ছোটবেলায় নানুজানের কাছ থেকে গল্প শুনেছি—

লাউয়ের ভিতর বইসা বুড়ি পাকনা তেঁতুই খায়
একখান *ঠেলা* দেওগে দেখি কদ্দুর দূরে যায়।

তেঁতুল নিয়ে খনার বচনটিও মনে করিয়ে দেই? তাল, তেঁতুল, কুল তিনে করে বংশ নির্মূল।

ভারতে এই তো কিছুদিন আগেও আমগাছের আম খাওয়া হতো না, যদি না সেই আমগাছের তেঁতুল গাছের সঙ্গে বিয়ে না হতো।

তেঁতুল গাছ নিয়ে কত না রহস্য! এই গাছে ভূত থাকে। খারাপ ধরনের হিংসুটে ভূত। ভালো ধরনের ভূত কোন গাছে থাকে তা অবশ্যি বলা নেই। মনে হয় বেল গাছে।

তেঁতুল গাছের নিচে ঘুমুলে হিংসুটে ভূতরা ক্ষতি করে। নলিনীকান্ত চক্রবর্তীর লেখা *ত্রিপুরার গাছপালায়* বলা হয়েছে, তেঁতুলের নিচে ঘুমুলে কুষ্ঠরোগ হয়। তেঁতুল তলায় বাস করলে বুদ্ধি কমে— এটিই লোকজ বিশ্বাস। এই নিয়ে বিখ্যাত গল্প আছে। মহাকবি কালিদাসের বুদ্ধি এতই বেশি ছিল যে তাঁর কথাবার্তা বেশির ভাগ মানুষই বুঝত না। মহাবিপদ দেখে কালিদাস কিছুদিন তেঁতুল তলায় বাস করে বুদ্ধি কমালেন।

কালিদাসকে জড়িয়ে তেঁতুল গাছের বিখ্যাত ধাঁধার উত্তর কি পাঠকদের জানা আছে?

কহেন কবি কালিদাস, শিশুকালের কথা
এক লক্ষ তেঁতুল গাছে কয় লক্ষ পাতা?

মেয়েরা অতি আগ্রহে তেঁতুল খায়, তারা কি জানে সংস্কৃতে তেঁতুলের নাম 'যমদূতিকা' অর্থাৎ যমের দূত?

তেঁতুলের ইংরেজি নাম Tamarind. পারস্য দেশীয় গাছ Tamar Hind থেকে এসেছে Temarind. পারস্য দেশে এই গাছ এসেছে ভারতবর্ষ থেকে তা 'Hind' থেকেই বুঝা যাচ্ছে। তেঁতুল গাছের প্রজাতিসূচক নাম Indica বলে দেয় এই গাছ

ভারতের। যদিও অনেকেই বলছেন, এই গাছের আদি নিবাস মধ্য আফ্রিকা।

তেঁতুল মাঝারি আকৃতির গাছ হলেও এর একটি প্রজাতি বিশাল হয়। শ্রীলঙ্কায় একটা গাছের সন্ধান পাওয়া গেছে, যার গুড়ির বেড় ৪২ ফুট। গাছটি না-কি দুইশ' বছরের পুরনো।

তেঁতুলের বোটানিক্যাল নাম *Tamarindus indica* L. পরিবার Leguminosae.

এবার তেঁতুলের রসায়ন। এতে আছে প্রচুর Tartaric Acid, Thalic Acid, Oxalic Acid এবং Polysaccharide.

আমি যখন নর্থ ডেকোটা স্টেট ইউনিভার্সিটিতে পলিমার কেমিস্ট্রির ওপর Ph.D করছি, তখন আমাকে তেঁতুলের বীজ থেকে Water Solubu Polymer আলাদা করে বেশ কিছু কাজ করতে হয়েছিল। বাংলাদেশের তাঁতিরা তেঁতুলের বিচির পলিমার দিয়েই তাদের সুতায় মাড় দেন।

ভেষজ ব্যবহার

পাতা

- সর্দি, হাঁচি, নাক দিয়ে ক্রমাগত পানি পড়ায় তেতুলের কাঁচা পাতা সিদ্ধ করে সেই পানি খেতে হবে।
- অর্শ রোগে পাতা সিদ্ধ পানি এবং পুরনো তেঁতুল ভেজা পানি খেলে সারবে।
- আমাশা, মুখের ঘা।

ফল

- রক্তে কোলেস্টরল বেড়ে গেলে ধমনীগুলোর স্থিতিস্থাপকতা কমে। তেঁতুল তার মহৌষধ। তেঁতুল ভেজানো পানি শরবত করে নিয়মিত খেলে কোলেস্টরলের মাত্রা কমে আসে।
- পেটে গ্যাস হলেও তেঁতুল পানি কাজ করে।
- কিডনির সমস্যায় হাত-পা ফুলে গেলে তেঁতুল পানি খেলে আরাম হয়। সর্দি গর্মিতে (Sunstroke) বা 'লু লাগলে' তেঁতুল পানি অত্যন্ত উপকারী।

বীজ

- তেঁতুল বীজ যৌনশক্তিকে প্রবল করে বলে বলা হয়ে থাকে। শিবকালী *চিরঞ্জীব বনৌষধিতে* বলেছেন, এই বীজ বার্লির মতো করে খেলে ডায়াবেটিস কমে।

বাজনা

গাছের নাম বাজনা। গাজীপুর অঞ্চলে এই গাছ প্রচুর দেখা যায়। গা-ভর্তি বড় বড় কাঁটা। দেখতে কিম্ভূতকিমাকার। নুহাশ পল্লীতে বড় বড় বেশ কয়েকটা বাজনা গাছ ছিল। গাছের কোনোরকম গুণাগুণ কোথাও খুঁজে পাই নি বলে একটা গাছ রেখে বাকিগুলি কেটে ফেলতে বললাম। কর্মচারীদের মাথায় প্রায় আকাশ ভেঙে পড়ল। তারা বলল এই গাছের বীজ ভাঙলে অতি সুঘ্রাণের তেল তৈরি হয়। ঐ তেলে মুড়ি মেখে খাওয়া আর অমৃত খাওয়া না-কি একই। আমি খেয়ে দেখেছি। 'ওয়াক থু'র কাছাকাছি।

যাই হোক, বাজনা গাছের বোটানিক্যাল নাম *Zanthoxylum limonella* (Pennst) Alston. পরিবার Rutaceae. বাজনা গাছ কোনো কোনো অঞ্চলে বজরঙ নামেও পরিচিত। নেপালে এই গাছ অনেক দেখেছি। ফুলের রঙ সবুজাভ সাদা। গাছ ভর্তি করে যখন ফুল ফোটে, মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকতে হয়। এই গাছ শ্রীলঙ্কায় আছে, বার্মায় আছে। শ্রীলঙ্কা এবং দক্ষিণ পূর্ব-এশিয়ায় এই ফলের কালো বীজ মসলা হিসেবে ব্যবহার হয়।

বাজনা গাছের রসায়ন বিষয়ে কিছু বলতে পারছি না। শিবকালীর বইয়ে এই গাছ সম্পর্কে কিছু লেখা নেই। ভেষজ গুণ হলো, এর ফল মধুর সঙ্গে বেটে খেলে বাত রোগ সারে। শেকড়ের বাকল মূত্রকৃচ্ছ্রতায় উপকারী।

কাঁকড়ার চোখ

কাঁকড়ার চোখ গাছটার ইংরেজি নাম। কারণ গাছের ফল অবিকল কাঁকড়ার চোখের মতো। টকটকে লালের এক কোণে কালো ফোঁটা। সাইজেও কাঁকড়ার চোখের সাইজ। সঙ্গত কারণেই ইংরেজরা গাছের নাম দিয়েছেন কাঁকড়ার চোখ। বোটানিক্যাল নাম *Abrus precatorius*. পরিবার ফেবেসী।

বাংলায় এই গাছের নাম কুঁচফল গাছ। ঐ যে গান— 'কুঁচবরণ কন্যা তাহার মেঘবরণ কেশ।' সোনার দোকানির কাছে এই গাছের ফলের খুব কদর। কারণ রতির হিসাব এই গাছের ফলের ওজন থেকে এসেছে। সোনা পাঁচ রতি— এর অর্থ সোনার পরিমাণ পাঁচটা কুঁচ ফলের ওজনের সমান

তিন প্রজাতির কুঁচফল দেখা যায়। লাল বীজ, বীজের মাথায় কালো চোখ *Abrus precatorious* Linn.

কালো বীজ। বীজের মাথায় সাদা চোখ *Abrus pulchellus* wall.

সাদা বীজ, কালো চোখ *Abrus fruticulous* wall.

নুহাশ পল্লীতে অনেক কুঁচ গাছ আছে, তবে সবই লাল বীজ কালো চোখ।

ত্রিপুরার উদ্ভিদ বিজ্ঞানী প্রশান্ত কুমার ভট্টাচার্য কুঁচগাছকে বিষাক্ত গাছ হিসেবে আলাদা করেছেন (*বিষাক্ত গাছ থেকে সাবধান*, বিদ্যাপ্রকাশ, আগরতলা।) তিনি বলছেন এই গাছের বীজ, পাতা, মূল সবই বিষাক্ত।

কুঁচবীজে থাকে প্রচণ্ড বিষাক্ত টকসএলবুমিন এব্রিন। তার সঙ্গে থাকে গ্লোবিওলিন এবং প্রেটিওস। পাতা এবং মূলে থাকে বিষাক্ত অ্যালকালয়েড— গ্লাইক্রিরহিজিন।

অর্ধেকটা কুঁচবীজ খেলেই গরু এবং ঘোড়ার মতো প্রাণী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মারা যায়।

ঔষধি গাছ হিসেবে এর ব্যবহার চরক এবং সুশ্রুতের নিদান তত্ত্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

লোকজ ব্যবহার

গ্রামবাংলায় গর্ভপাতে এই গাছের বীজ ব্যবহার করা হয় বলে ঔষধি গাছের সব বইয়ে পেয়েছি। ব্যবহারের পদ্ধতি কী বুঝতে পারছি না। বলা হয়েছে অর্ধেকটা

বীজ খেতো করে ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে গর্ভপাত ঘটে। বীজ নিশ্চয়ই খাওয়ানো হয় না। বিষাক্ত এব্রিনের কারণে খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তো মৃত্যু হবার কথা।

জটিল মাথাব্যথায়

কুঁচফল গুঁড়া করে নস্যির মতো টানলেই কঠিন মাথাব্যথা সারবে।

বমি করাতে

কুঁচের মূল বেঁটে এককাপ গরম পানিতে গুলে খেলেই বমি হবে।

টাকের চিকিৎসায়

কুঁচফল (সাদা কুঁচ) বেটে প্রলেপ দিতে হবে। প্রলেপ দেবার আগে ডুমুর পাতা দিয়ে টাক ঘষে নিতে হবে।

গোড়া ক্রিমিতে

একটা কুঁচ খেতলিয়ে এক কাপ গরম পানিতে ভিজিয়ে ছেঁকে সেই পানি খেলেই আরাম হবে।

আমার মতে, কুঁচ নিয়ে কোনো চিকিৎসায় না যাওয়াই ভালো। কী দরকার খামাখা বিপদ ডেকে আনার? হাতের কাছে যদি অ্যান্টি এব্রিন সেরাম ইনজেকশন না থাকে, তাহলে বীজের এব্রিন বিপদ ডেকে আনবে।

কুঁচ গাছ নিয়ে মজার লোকজ বিশ্বাসের একটা গল্প দিয়ে শেষ করি।

কুঁচগাছের পাতা বশীকরণে ব্যবহার হয়। যাকে বশ করতে হবে, তাকে তরকারির সঙ্গে কুঁচের পাতার রস বা কুঁচপাতা খাইয়ে দিতে হবে। যে খাবে সে না-কি জীবনের জন্যে বশ হবে!

নিসিন্দা

সতিনের সঙ্গে তিক্ত সম্পর্কের উদাহরণ হিসেবে নিসিন্দা বৃক্ষের কথা চলে আসে—

'নিম তিতা, নিসিন্দা তিতা, তিতা পানের খর (খয়ের)
তারো চেয়ে অধিক তিতা
দুই সতিনের ঘর।'

বাংলাদেশের সব জায়গায় এই গাছ আছে। তবে বইপত্রের বর্ণনার সঙ্গে বাংলাদেশের নিসিন্দা গাছ মিলে না। বলা হয়েছে— নিসিন্দা ছোট আকৃতির পত্রঝরা গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ (*ঔষধি গাছগাছড়া*, এবিএম জাওয়ায়ের হোসেন, গ্রন্থনা)। আমি নুহাশ পল্লীতে দেখেছি বিশাল গাছ। এই গাছের পাতা ঝরে পড়তেও দেখি নি। বাংলাদেশে শীতপ্রধান দেশ থেকে আসা গাছের পাতাই শীতের সময় ঝরে যায়। নিসিন্দা পুরোপুরি বাংলাদেশের বৃক্ষ। শীতকালে এর পাতা ঝরবে কোন দুঃখে?

এমন কি হতে পারে নুহাশ পল্লীর চারটা নিসিন্দা গাছ বিশেষ কোনো কারণে পাতা ঝরায় না? ড. এ কে ভট্টাচার্য তাঁর *ভারতীয় ভেষজ* গ্রন্থে লিখেছেন— 'নিসিন্দা উচ্চতায় মাত্র তিন ফুট হয়। শরৎকালে পাতা ঝরে যায়।'

পাতা ঝরাবিষয়ক বিতর্ক আপাতত হাঁড়িচাপা থাকুক, অন্য প্রসঙ্গে আলোচনা চলুক। নিসিন্দার বোটানিক্যাল নাম— *Vitex negundo* Linn. বোটানিক্যাল নাম *negundo* আমাকে ধাঁধায় ফেলেছে। নামটির মূলে আছে ইউরোপের ম্যাপল জাতীয় গাছ, যে গাছের রস মিষ্টি। এই মিষ্টি রস থেকে ম্যাপল সুগার তৈরি হয়।

আরবিতে নিসিন্দার নাম— 'পচতিরা'। আমি বেশ অবাক হয়েই লক্ষ করছি, বৃক্ষশূন্য আরব দেশে বেশিরভাগ ঔষধি গাছের আরবি নাম আছে। প্রাচীন আরবে চিকিৎসাবিজ্ঞানের চর্চা ও বিকাশ সম্পর্কে আমরা জানি। ঔষধি বৃক্ষের আরবি নাম সেই কথাই বলে।

যাই হোক, নিসিন্দার দু'টি প্রজাতি দেখা যায়। একটি নীল ফুল ফোটায়। তার নাম নির্মুণ্ডি। অন্য প্রজাতিটি ফোটায় সাদা ফুল। এই প্রজাতি সিন্দুবার নামে পরিচিত।

নিসিন্দার রসায়ন

এলকালয়েড তো (নাইট্রোজেনঘটিত যৌগ) থাকবেই। যার একটির নাম Nishindine, অন্য এলকালয়েডগুলিকে আলাদা করা যায় নি। নিসিন্দায় Sterol আছে এবং Terpenoid জাতীয় যৌগ আছে।

আমি নিজে কেমিস্ট্রির ছাত্র। কাজেই বৃক্ষ-রসায়ন সম্পর্কে আরো ভালোভাবে কথা বলা উচিত ছিল।

ব্যবহার

বাংলাদেশে দাঁত মাজতে নিমের মাজন ব্যবহার করা হয়। নিমের পরেই নিসিন্দার ব্যবহার। নবিজি (দ.) মেছওয়াক করতেন, কাজেই বাংলার ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা নিম-নিসিন্দার ডাল দিয়ে নবিজির (দ.) সুন্নত পালন করেন।

ধান, চাল, ডাল জাতীয় শস্যকে পোকামাকড়ের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে নিসিন্দার পাতার ব্যাপক ব্যবহার আছে। গোলার শস্যের ওপর নিসিন্দার পাতা ছড়িয়ে দিলে পোকামাকড়ের সংক্রমণ হবে না।

নিসিন্দার পাতা মেশানো পানিতে রোগগ্রস্ত মানুষকে স্নান করানোর প্রাচীন রেওয়াজ আছে। আমি নিশ্চিত এই গাছের পাতার জীবাণু বিধ্বংসী ক্ষমতা আছে। ভেষজ গবেষকরা কি এগিয়ে আসবেন ?

ভেষজ চিকিৎসার জনক চরক বলেছেন— 'ফণা আছে এমন সাপে যদি কাউকে দংশন করে, তাহলে তাকে শ্বেত নিসিন্দার মূলত্বক পিষে পানির সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়াবে।'

ভেষজ চিকিৎসার আরেক গ্রান্ডমাস্টার চক্রদত্ত বলছেন— 'নীল নিসিন্দার মূলের ছাল পিষে নস্যের মতো নাক দিয়ে টেনে নিলে গলগণ্ড রোগ সারবে।'

সাধারণ ভেষজ ব্যবহার

- অর্বুদ (টিউমার) : শরীরের কোনো জায়গায় টিউমার হলে নিসিন্দার পাতা বেটে গরম করে কয়েকদিন লাগালেই টিউমার সারবে।
- সূতিকা রোগ : সূতিকা সারবে নিসিন্দা পাতা সেদ্ধ পানিতে গোসল করলে।
- ফেরেনজাইটিস, টনসিলাইটিস : পাতা সেদ্ধ পানি দিয়ে সেই পানি মুখে রাখতে হবে এবং গার্গল করতে হবে।
- বেডসোর (Bedsore) : শুকনা নিসিন্দার পাতা গুঁড়া করে ক্ষতে ছড়িয়ে দিলে দ্রুত রোগ সারে।
- জিভে বা মুখে ঘা : কিছু জিভ বা মুখের ঘা আছে যা কিছুতেই সারতে চায়

না। নিসিন্দা পাতার রস ঘি দিয়ে জ্বাল দিয়ে পেস্টের মতো বানিয়ে ঘায়ে দিলে নাকি ঘা সারবেই।

প্রাচীন ভারতের কিংবদন্তি চিকিৎসক সুশ্রুতের একটা কথা এই ফাঁকে বলে নেই,

'প্রাণ রক্ষা পেতে পারে প্রাণ দিয়েই'।

— সুশ্রুত

উদ্ভিদ প্রাণ। সিনথেটিক ওষুধ কি প্রাণ? আধুনিক পৃথিবী সিনথেটিক ওষুধনির্ভর হয়ে পড়েছে। সুশ্রুতের জন্যে দুঃসংবাদ।

বিলম্বী

বিলম্বীর বোটানিক্যাল নাম *Averrhoa bilimbi L.* বোটানিক্যাল নামের শুরুটা গণসূচক, পরের অংশ প্রজাতিসূচক। বিলম্বীর বোটানিক্যাল নামের গণসূচক শব্দটা এসেছে আরবের বিখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানী Averrhoa-র কাছ থেকে। বিলম্বী গাছ আরবে জন্মায় না, অথচ তার নামকরণে আরবের চিকিৎসা-বিজ্ঞানীর নাম চলে এল। ব্যাপারটা অদ্ভুত না? বিলম্বীর গোত্র নাম Averrhaacea.

বিলম্বী সহজলভ্য গাছ না। বাংলাদেশে নার্সারির কল্যাণে এই গাছ প্রচুর পাওয়া যায়। গাছের ফুল লাল কিংবা বেগুনি। গরমের সময় ফুল ফোটে। ফল পাওয়া যায় শীতকালে।

ফলের স্বাদ কামরাঙার মতো। ভালো টক। আচার বানানো ছাড়া এই ফলের আর কোনো ব্যবহার আছে বলে আমি জানি না। ত্রিপুরায় এই ফল দিয়ে টক রান্না করা হয়। বিলম্বীর পাকা ফল থেকে স্ট্রবেরীর গন্ধ বের হয়।

ভেষজ ব্যবহার

- বিলম্বী ফলের সিরাপ আন্ত্রিক রক্তক্ষরণ রোগে খুব উপকারী। জ্বর কমানোয় এই ফলের ভূমিকা আছে। বিলম্বী স্কার্ভি রোগ প্রতিরোধ করে।
- বিলম্বির পুষ্টিগুণ ভালো। এতে প্রচুর ক্যারোটিন আছে। সেই সঙ্গে শর্করা, প্রোটিন, স্নেহজাতীয় পদার্থ এবং খনিজ লবণ। একের ভেতর অনেক।

নিম

নিমের বোটানিক্যাল নাম *Azadirachta indica* A. Tuss, নামের প্রথম অংশ পারসিক শব্দ থেকে এসেছে, আর Indica যে India তা বুঝতে না পারার কারণ নেই। নিম পুরোপুরি এ দেশীয় গাছ, যদিও কিছু বইপত্রে পড়েছি এর আদি নিবাস বার্মা।

এখন সারা পৃথিবীতেই নিমের চাষ হচ্ছে। এর ভেষজগুণ নিয়ে রীতিমতো হৈচৈ। শুনেছি আমেরিকানরা এই গাছের Patent নিয়ে নিতে চাচ্ছে। এ নিয়েও নানান আন্দোলন। বাংলাদেশেও নিম গাছ নিয়ে একটা ফাউন্ডেশন আছে, নাম— বাংলাদেশ নিম ফাউন্ডেশন। জনাব এম. এ হাকিম বাংলাদেশ নিম ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নিমকে 'একুশ শতকের বৃক্ষ' বলে ঘোষণা দিয়েছে। বলা হচ্ছে প্রাণীকুল এবং উদ্ভিদকুলের মধ্যে এমন উপকারী গাছ এখনো আবিষ্কৃত হয় নি। বাতাসে অক্সিজেন ছেড়ে বাতাস বিশুদ্ধ করার ক্ষমতা নিমের মতো অন্য কোনো বৃক্ষেরই নেই, এই সত্য আজ বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত।

বাংলাদেশের প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান একবার হজ্বে যাবার সময় সৌদি রাজার জন্যে উপহার হিসেবে পঞ্চাশটা নিম গাছের চারা নিয়ে গিয়েছিলেন। আরবের ঊষর মরুভূমিকে এই নিম ছায়াময় করে তুলেছে। আরবের একটি অংশ আজ নিমময়। আরবে এই গাছকে এখন আদর করে বলা হচ্ছে 'জিয়া গাছ'।

জিয়া পরিবারের নানান কর্মকাণ্ড পত্রিকায় পড়ে আমি যখন হতাশ, তখন এই পরিবারের প্রতিষ্ঠাতার প্রশংসাযোগ্য একটি কর্মকাণ্ডের কথা বললাম।

ভারতে নিম পবিত্র গাছ হিসেবে পরিচিত। ঠাকুর দেবতার মূর্তি নিম কাঠ ছাড়া তৈরি হতো না। জগন্নাথ দেবের দারুমূর্তি বিশেষ লক্ষণযুক্ত নিমগাছের কাঠ ছাড়া কখনোই তৈরি হয় না।

বাংলাদেশের গ্রামে নিমের লোকজ প্রধান ব্যবহার দাতনে। নবিজি (দ.) দাতন করতেন বলে ইতিহাসে উল্লেখ আছে। কাজেই ধর্মপ্রাণ মানুষ নবির সুন্নত হিসেবে টুথপেস্ট এবং ব্রাশ ব্যবহার না করে নিমের দাতন ব্যবহার করে।

যখন বসন্তের টিকা বা ওষুধ কিছুই ছিল না, তখন বসন্তরোগীকে নিমগাছের ছায়ায় শুইয়ে রেখে নিমের ডাল দিয়ে বাতাস করা হতো।

প্রাচীন ভারতে বাড়ির দক্ষিণে অবশ্যই নিমগাছ থাকত। যাতে বছরের বেশিরভাগ সময় যেন নিমের পবিত্র বিশুদ্ধ বাতাস ঘরে ঢোকে। প্রাচীন বাংলার আঁতুড় ঘরের দরজায় একগাদা নিমের ডাল ঝুলিয়ে রাখা ছিল অতি আবশ্যকীয় কর্মকাণ্ড। তখন ধারণা করা হতো নিমপাতা শিশুদের অপদেবতার হাত থেকে রক্ষা করে।

নিম অতি তিক্ত গাছ, কিন্তু তার ফল পাখিদের প্রিয় খাদ্য। ফলের বীজ থেকে সুগন্ধি তেল হয়। এই তেলের বড় অংশই সাবান তৈরিতে ব্যবহার হয়। বাংলাদেশের একজন লেখক যার নামের আদ্যক্ষর 'হু', নিম সাবান ছাড়া অন্য কোনো সাবান ব্যবহার করেন না। তাঁর কাছে না-কি এই সাবানের গন্ধ অদ্ভুত লাগে।

নিমের ভেষজগুণ নিয়ে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লেখা যায়। লিখতে ইচ্ছা করছে না। আমেরিকান বৈজ্ঞানিকরা ১৯৭২ সন থেকে নিম নিয়ে গবেষণা করছেন। গবেষণার ফলাফলে জার্নাল ভর্তি। Internet-এর বোতাম চাপলেই সব তথ্য বের হয়ে আসবে।

নিম বিষয়ে ব্যক্তিগত দুঃখের কাঁদুনি দিয়ে লেখা শেষ করি। নুহাশ পল্লীতে ত্রিশ-চল্লিশটার মতো নিমগাছ আছে। গাছগুলি কেমন যেন মরা মরা। অন্যসব গাছ স্বাস্থ্য-সৌন্দর্যে ঝলমল করছে। নিম গাছগুলিই শুধু চিমসি মেরে আছে। এরা মনে হয় আমাকে পছন্দ করে না।

নিমের গোত্র : Meliaceae

মেহগনি এবং তুন বৃক্ষও একই গোত্রের। ভালো কথা, আমাদের পবিত্র গ্রন্থে 'তুন' বৃক্ষের উল্লেখ আছে। তুন গাছ আমার সংগ্রহে নেই বলে এই গাছ বিষয়ে কিছু লিখতে ইচ্ছা করছে না।

নীল রঙের নয়নতারা (মৃত্যুফুল)

গোলাপি রঙের নয়নতারা (মৃত্যুফুল)

বাজনা

বরুন

তেলাকুচা

লটকন

ঘেটু

হিং

বেল

খয়ের

পুত্রঞ্জীব

খয়ের

নুহাশ পল্লীতে একটা খয়ের গাছ আছে। গাছটা সংগ্রহ করা হয়েছে বরেন্দ্র অঞ্চল থেকে। তেঁতুল গাছের মতো পাতা। কাঁটায় ভর্তি। ভারতবর্ষে ১৮ প্রজাতির খয়ের গাছ আছে। কিছু প্রজাতির গাছ না-কি সত্তর-আশি ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। নুহাশ পল্লীর খয়ের গাছটিও দ্রুত বাড়ছে। শেষ পর্যন্ত কত বড় হবে কে জানে!

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে খয়েরের কথা বারবার এসেছে। পানের সঙ্গে খয়ের খেলে ঠোঁট লাল হবে। কন্যার ঠোঁট লাল না হলে সৌন্দর্যই তো ফুটবে না। ভাগ্যিস লিপস্টিক বাজারে এসেছে। এই বস্তু না থাকলে তো খয়েরের ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়ত। আজকাল অবশ্যি বাজারে কালো লিপস্টিকও পাওয়া যাচ্ছে। কালো ঠোঁটের সৌন্দর্য আমাকে এখনো টানছে না। ভবিষ্যতে হয়তো টানবে।

যাই হোক, খয়ের গাছের বোটানিক্যাল নাম *Acacia catechu* willd পরিবারের নাম Leguminosae.

রসায়ন

খয়েরে আছে α, β এবং γ catechin, 1-epicatechin এবং catechotannic অ্যাসিড। খয়েরে Tannin-ও আছে। Tannin নামের এই যৌগটি অবশ্যি বেশিরভাগ গাছেই আছে।

ব্যবহার

মহিলাদের জন্যে সুসংবাদ, খয়ের মহিলাদের যৌবন দীর্ঘস্থায়ী করে। যারা দীর্ঘ যৌবন চান, তারা এখন থেকে পান খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পানে খয়ের ব্যবহার শুরু করতে পারেন।

প্রতিটি সুসংবাদের সঙ্গে একটি দুঃসংবাদও থাকে। খয়ের গায়ের চামড়া কালো করে। এবং এটি গর্ভস্রাব কারক।

কোনো মহিলাই গাত্রবর্ণ কালো হোক তা চাইবেন না, তবে এর একটি ভালো দিক আছে। যাদের শ্বেতীরোগ আছে, খয়ের ব্যবহারে সেই রোগের প্রকোপ কমবে। কারণ চামড়ার Pigmentation বাড়িয়ে দেবে।

গায়ক-গায়িকাদের পান খেতে দেখা যায়। পানের রস গলার স্বরকে মিষ্টি করে এমন কথা প্রচলিত আছে। পানের সঙ্গে খয়ের খেলে সেই খয়ের স্বরভঙ্গ দূর করে।

যখন সিফিলিস এবং গনোরিয়ার কোনো চিকিৎসা ছিল না, তখন প্রাচীন ভারতীয় ভেষজবিদরা ক্ষতস্থানে খয়ের চূর্ণ ব্যবহার করে বিশেষ ফল পেতেন বলে দাবি করেছেন।

বলা হয়েছে অল্পমাত্রায় খয়ের যৌন সম্ভোগ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। ভায়াগ্রার বিকল্প হিসেবে এটা ব্যবহারের চিন্তাভাবনা করা যেতে পারে। তবে যা করবেন নিজ দায়িত্বে করবেন। আমি বইপত্রে যা পড়েছি তাই লিখছি।

মটুদের জন্যে সুসংবাদ

খয়ের মেদ কমায়। প্রাচীন ভেষজ গ্রন্থে গুরুত্বের সঙ্গে মেদ কমানোর কথা বলা হয়েছে। স্থূল ব্যক্তিরা প্রতিদিনই ১০/১৫ গ্রাম খয়ের কাঠের ক্বাথ খাবেন। গায়ের রঙ সামান্য কালো হয়ে যাবে। সেটা তেমন কোনো বড় ক্ষতি না। 'মেদ ভুঁড়ি কী করি'র হাত থেকে তো বাঁচা যাবে।

শেষ কথা

খয়ের নামের অর্থ হিংসুক। সে সকল রোগ-ব্যাধিকে হিংসা করে বলেই এই নাম।

বেঁচে থাকুক এই হিংসুক বৃক্ষ। হিংসা সবসময়ই যে খারাপ তা কিন্তু না।

কৃষ্ণবট

শ্রীকৃষ্ণ ননী চুরি করতেন। চুরি করা ননী লুকিয়ে রাখা বিরাট সমস্যা। বালক কৃষ্ণ এই সমস্যার সমাধান করলেন। তিনি একটা গাছ খুঁজে বের করলেন, যার পাতাগুলি ঠোঙার মতো। বালক কৃষ্ণ এই পাতার ঠোঙায় ননী লুকিয়ে রাখতেন বলেই গাছের নাম কৃষ্ণবট।

এই হচ্ছে নামকরণের পৌরাণিক শানে নজুল। উদ্ভিদ বিজ্ঞানী C D E Candolle কৃষ্ণবটকে উদ্ভিদের এক নতুন প্রজাতি হিসেবে ঘোষণা দেন। যদিও তার ঘোষণা টিকে নি। বর্তমানে কৃষ্ণবটকে বটগাছের এক প্রজাতি হিসেবে ধরা হয়। বৈজ্ঞানিক নাম *Ficus bengalensis var.* Krishnea. বোটানিক্যাল নামে অবশ্যি শ্রীকৃষ্ণ স্থান পেয়েছেন। এই গাছের গোত্র Moraceae. আরেকটি কথা, বোটানিক্যাল নামে *bengalensis* বঙ্গদেশ বুঝায়।

উদ্ভিদ বিজ্ঞানী নলিনীকান্ত চক্রবর্তী তার বই *ত্রিপুরার গাছপালায়* লিখেছেন—

'পঞ্চাশের দশকে কলিকাতা হতে চারা এনে একটি কৃষ্ণবট কলেজটিলায় মহারাজা বীরবিক্রম কলেজের ছেলেদের কমন রুমের পেছনে লাগানো হয়। যা কালক্রমে বিশাল বৃক্ষে পরিণত হয়। আমি কলেজে থাকাকালীন ছাত্রদেরকে এই বৃক্ষটি প্রতি বছর দেখাতাম। বছরখানিক আগে জানতে পারি কে বা কারা গাছটি নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। আমার জানামতে ত্রিপুরায় বর্তমানে আর এই জাতের গাছ নেই।'

নলিনীকান্ত বাবুর মনের কষ্ট বুঝতে পারছি। তবে আমার মনে আনন্দ হচ্ছে একটি কারণে যে, নুহাশ পল্লীতে কৃষ্ণবটের একটা গাছ আছে। পাতাগুলি ঠোঙার মতো। প্রকৃতি তার বৃক্ষ জগৎ নিয়ে কত মজাই না করে!

ঘেঁটু

বিভূতিভূষণ যারা পড়েছেন তারা ঘেঁটু ফুল চেনেন। তাঁর বইয়ে ঘেঁটু ফুলকে তিনি ভাট ফুল বলেছেন। ভাট ফুলের সৌন্দর্যে বারবার অভিভূত হয়েছেন। ভাট গাছ কিংবা ঘেঁটু গাছ গ্রামবাংলার ঝোপঝাড়ে অযত্ন-অবহেলায় বড় হয়। কেউ ফিরেও তাকায় না। বিভূতিভূষণের কারণে আমি ফিরে তাকালাম। অতি যত্নে একটা ভাট গাছ এনে নুহাশ পল্লীতে লাগালাম। গোবর দেয়া হলো, সার দেয়া হলো। হল্যান্ডের এক কোম্পানির Slow reloax nutrients-এর একটা ট্যাবলেটও দেয়া হলো।

ভাট ফুল গাছ অপ্রত্যাশিত এই আদর-যত্নে হলো অভিভূত। ঝাঁকড়া গাছ পাতায় পুষ্পে ঝলমল করতে লাগল।

ঘেঁটু গাছের আরেক নাম ঘন্টাকর্ণ। ঘন্টাকর্ণ পৌরাণিক নাম। মা শীতলার (গুটি বসন্ত যার কল্যাণে [!] ছড়ায়) স্বামীর নাম ঘন্টাকর্ণ।

যাই হোক, গাছটার বোটানিক্যাল নাম *Clerodendrum fragrans* পরিবার হলো Verbenaceae.

রসায়ন

ভাট ফুলে আছে Clerodin, Sterol, Xanthophyll এবং Carotene. এর পাতায় আছে Protein 21.2%, Fibre 14.8%, Reducing sugar 3.0%, Total sugar 17.0%। ভাটের পাতায় কয়েক ধরনের অ্যাসিডও আছে, যেমন Linolenic acid, Obic acid, Stearic acid, Lignoceric acid.

ভাটের রসায়নে প্রচুর চিনি আছে বলে বলা হচ্ছে। আমি পাতা চিবিয়ে দেখেছি, মহা তিতা, প্রায় নিসিন্দার তিতার মতো।

ভেষজ ব্যবহার

- চর্ম রোগ : যে-কোনো ধরনের চর্মরোগে ভাটগাছের রস দু'তিন দিন লাগালেই রোগ সারবে।
- পেট ফাঁপা : বিয়ে বাড়িতে প্রচুর খাওয়া-দাওয়ায় পেট ফেঁপেছে। টক ঢেকুর উঠছে, প্রাণ যায় অবস্থা। সহজ চিকিৎসা। ঘেঁটু মূলের ছাল তিন-চার গ্রাম বেটে খেয়ে নিতে হবে।

- কৃমিতে : প্রতিদিন খালি পেটে ঘেটু পাতার রস দু'চামচ খেলে কোনো কৃমিই থাকবে না।
- ম্যালেরিয়ায় : দেশে কুইনাইন আসার আগে ম্যালেরিয়াতে ঘেটু পাতার রস খাওয়ানো হতো।
- টিউমারে : সাধারণ টিউমারের (ক্যান্সার না, এমন) ভালো চিকিৎসার কথা উল্লেখ করছি— ঘেটু পাতা এবং তার মূলের ছাল বেটে টিউমারে কয়েকবার লাগালে টিউমার মিলিয়ে যাবে।
- উকুনে : মাথার উকুনের নানান ওষুধপত্র এবং শ্যাম্পু পাওয়া যায়। ভেষজ চিকিৎসা করে দেখলে কেমন হয়? ঘেটু পাতার রস মাথায় মেখে গোসল সেরে নিলে উকুনের ভুষ্টিনাশ হবার কথা।

ঘন্টাকর্ণের একটা পৌরাণিক রূপ আছে। সেই রূপটা বলে নেই। ঘন্টাকর্ণ একজন অপদেবতা। তার দুই কানে ঝুলন্ত ছ'টা ঘন্টা। সে যখন চলাফেরা করে, তখন বিকট শব্দে কানে ঘন্টা বাজে। সাধারণ মানুষ এই ঘন্টাধ্বনি সহ্য করতে পারে না। অনেকেই মৃত্যুবরণ করে।

পুত্রঞ্জীব

ভারতের উদ্ভিদ উদ্যানের প্রথম পরিচালকের নাম উইলিয়াম রক্সবার্গ। তাঁকে আধুনিক ভারতীয় উদ্ভিদবিদ্যার জনক বলা হয়। অনেক বোটানিক্যাল নামে রক্সবার্গের নাম আছে, যেমন— *Putranjiva roxburghii* Wall. বোটানিক্যাল নামের প্রথম অংশটি ভারতীয় 'পুত্রঞ্জীবা'। গাছের বাংলা নাম জিয়নপুত্র কিংবা জিয়াপুত্র।

অদ্ভুত নামকরণের কারণ জনৈক সন্ন্যাসীর দেয়া উপহার এই গাছের বীজ থেকে জনৈকা ভারতীয় তরুণীর মৃতপুত্র জীবন লাভ করেছিল।

এখনো অনেকে বিশ্বাস করেন, এই গাছের বীজ শিশুদের অপদেবতার হাত থেকে রক্ষা করে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের অনেক শিশুকে এই গাছের বীজ গলায় বা কোমরের ঘুনসিতে পরতে দেখা যায়।

সাধু-সন্ন্যাসীরা রুদ্রাক্ষের মালার সঙ্গে পুত্রঞ্জীব বৃক্ষের বীজের মালাও গলায় পরেন।

মাঝারি আকারের বৃক্ষ। গরমের সময় সাদা ফুল ফোটে। গাছের বাকল কালো। পাতা ছোট রঙ গাঢ় সবুজ। শুনেছি গাছটি দেখতে সুন্দর। শুনেছি এই কারণে বললাম যে, এই গাছ আমি এখনো চোখে দেখি নি। নুহাশ পল্লীর ওষুধি বাগানে এই গাছ নেই।

ভেষজ গুণ

গাছটির ফল ও পাতা এনালাজসিক— জ্বর কমায়। বীজ থেকে তেল পাওয়া যায়। কেরোসিনের আগমনের আগে এই গাছ এবং রেড়ি গাছের বীজের তেল দিয়ে প্রদীপ জ্বালানো হতো। পুত্রঞ্জীব গাছের বীজের তেলের আলো অতি নরম এবং অতি স্নিগ্ধ বলে বইপত্রে লেখা। পরীক্ষা করার উপায় পাচ্ছি না।

গাছটির গোত্র : Euphorbiaceae.

রেড়ি গাছও একই গোত্রের।

রাণীর ফুল / জারুল

জারুল গাছের ইংরেজি নাম Queen's Flower. আবার কিছু বইতে লেখা Pride of India.

অতি বিনয়ের সঙ্গে বলছি— আমি রাজা-রাণী গোত্রের কেউ না— আমজনতার একজন হিসেবে জারুল ফুলের মহাভক্ত। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রজীবনে মোহসিন হলে থাকতাম। হেঁটে হেঁটে কার্জন হলে যেতাম এবং মুগ্ধ চোখে দু'পাশের বিশাল জারুল গাছগুলির ফুলগুলির দিকে তাকাতাম। মনের অজান্তে কতবার যে বলেছি— 'আহারে!'

গাছটির বোটানিক্যাল নামে একজন সুইডিস বিজ্ঞানী আছে— Lagerstrom. বোটানিক্যাল নাম *Lagerstroemia speciosa* Pers.

গাছের পরিবার Lythraceae.

পাতাঝরা টাইপ গাছ, তবে সব পাতা আমি নিজে কখনো ঝরে যেতে দেখি নি। এপ্রিল-মে মাসে ফুল ফোটে, পৃথিবী নীল রঙে রাঙিয়ে দেয়।

ভেষজ গুণ

নলিনিকান্ত চক্রবর্তীর বইতে পড়লাম, এই গাছের ফুল আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে ক্ষত নিবারণে ব্যবহার করা হয়।

গাছের বীজ ঘুমের ওষুধ হিসেবে অত্যন্ত কার্যকর। শিকড় জ্বর কমায়। বাকল এবং পাতা কোষ্ঠকাঠিন্যের না-কি মহৌষধ।

লটকন

লটকনের বোটানিক্যাল নাম *Bixa orellana* L. Bixa শব্দটি দক্ষিণ আমেরিকার, কাজেই ধারণা করা হয় লটকন ছড়িয়েছে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে। চীন দেশে এই গাছের নাম রঙগাছ। কারণ চীনে প্রথম লটকনের বীজ শুকিয়ে রঙ তৈরি করা হয়। ইংরেজিতে গাছের নাম বাঁদরের তেঁতুলবৃক্ষ (Monkey Turmeric)।

বাংলার গ্রামেগঞ্জে ঝোপে-ঝাড়ে অযত্ন-অবহেলায় এই গাছ প্রচুর হয়। ফল হয় গরমে। গ্রামের শিশুদের অতি পছন্দের ফল। ইদানীং দেখছি শহরের বাজারও এই ফল দখল করেছে। আঙ্গুরের কেজি এবং লটকনের কেজি তুল্যমূল্য।

লটকনের রসায়ন বিষয়ে বলা যাক। পাতায় আছে Essential oils. যেমন bixaghanene এবং flavonoids, এছাড়াও আছে 7-bisulphateo of apigenin, buteolin.

বিচিতে আছে Cartenoid, bixin এবং fatty oils. কিছু alcoholও থাকে, নাম bixol.

গাছের মূলে আছে Triterpenes, tomentosis acid.

ভেষজ ব্যবহার

গাছের মূল পানিতে সেদ্ধ করে ছাঁকার পর যা পাওয়া যায় (water extract) খিচুনিতে উপকারী। জন্ডিসেও অত্যন্ত কার্যকর।

প্রাচীনকালে এই গাছের বাকল এবং বিচি গনোরিয়া রোগে ব্যবহার করা হতো।

বিচি ডিসেনট্রিতে উপকারী, ফল প্রস্রাবকারক এবং রেচক। এপেলেপ্সি রোগে লটকনের ফল ও বিচি খুব কাজ করে। ভারতীয় ভেষজবিদ না, আধুনিক ইউরোপের গবেষকদের গবেষণায় এই তথ্য বের হয়ে এসেছে।

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির একটি বই *Medicinal Plants of Bangladesh* (Abdul Ghani) থেকে আমি ভেষজ রেফারেন্স নিয়েছি।

এখন শুনি আর্য়ুবেদশাস্ত্রীরা কী বলেন— এই গাছের পাতা, বীজ ও শিকড় জ্বর উপশমের ক্ষমতা রাখে। কফ, বাত, মাথা ধরা, কুষ্ঠ, বমি এবং পিত্তের সকল পীড়ায় উপকারী।

হিং

অনেক বছর ধরেই বাংলাদেশে বৃক্ষমেলা হচ্ছে। বাণিজ্য মেলা, বইমেলার পাশাপাশি বৃক্ষমেলা যথেষ্ট গুরুত্ব পাচ্ছে। ইট-কংক্রিটের শহর ঢাকার মানুষরা যে হারে গাছ কেনেন তা দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক, এ গাছ তারা কোথায় লাগাবেন ? জায়গা কই ?

বৃক্ষমেলা থেকে গাছ কেনার কিছু বিপদ আছে। আমি একটির উল্লেখ করছি। একবার বৃক্ষমেলা থেকে আগ্রহ করে আমি একটা হিং গাছ কিনলাম। হিং অতি দুর্লভ গাছ। আফগানিস্তানের পাহাড়ে অযত্নে বড় হয়। আফগানিরা হিং-এর আটা জমা করেন। একসময় সেই হিং নিয়ে ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েন। 'চাই হিং চাই হিং!' ধ্বনি শোনা যায়।

হিং-এ বিশেষ ধরনের (ক্ষুধা উদ্রেকদায়ী) গন্ধ আছে। এই কারণেই নানা খাদ্যদ্রব্যে হিং-এর ব্যবহার হয়। যারা প্রায়ই কোলকাতা যাতায়াত করেন, তাঁদের অনেকেই নিশ্চয় হিং-এর কচুরি খেয়েছেন।

যাই হোক আমি হিং-এর দুর্লভ চারা অতি যত্নে নুহাশপল্লীতে লাগালাম। যত্ন-আত্তি চলতে থাকল। জৈব-অজৈব নানান সার দেয়া হলো। হল্যান্ড থেকে আনা Slow realising nutrients-এর ট্যাবলেট দেয়া হল। আমাদের পরিশ্রম বৃথা গেল না। পাহাড়-পর্বতের এই গাছ বাংলার মাটিতে দ্রুত বড় হলো এবং এক সময় ফুল ফুটল। ফুল দেখে আমি হতভম্ব। এ তো গন্ধরাজ ফুল! হিং গাছে গন্ধরাজের ফুল ফুটবে কেন ? হিং-এর ফুল হবে ছোট ছোট হলুদ রঙের। ফুলগুলি পুষ্প মঞ্জুরির মতো সাজানো থাকবে। বইপত্রে তাই বলে। হিং গাছে গন্ধরাজ ফুল ফোটার কারণ নেই।

যাদের কাছ থেকে এই গাছ কিনেছিলাম, কয়েক বছর পর কাকতালীয়ভাবে তাদের সঙ্গে দেখা। আমি হিং গাছে গন্ধরাজ ফুলের কারণ জিজ্ঞেস করতেই তারা বললেন, হিং গাছ বাংলাদেশের মাটিতে হয় না। গন্ধরাজ গাছের সঙ্গে গ্রাফটিং করতে হয়। আপনি কোনো কারণে মূল হিং গাছ কেটে ফেলেছেন বলেই এই সমস্যা হয়েছে।

এখন অবশ্যি নুহাশ পল্লীতে হিং গাছ আছে। গাছ থেকে আঠা সংগ্রহ এখনো করা হয় নি। কখনো হবে সেই সম্ভাবনা ক্ষীণ। কারণ আঠা সংগ্রহ করতে

হলে গাছটা গোড়া থেকে কেটে ফেলতে হয়। কাটা গাছে মাটির হাঁড়ি উপুড় করে রাখতে হয়। সেখানে আঠা জমে। তিন মাস আঠা সংগ্রহ করা হয়। সেই আঠা রোদে শুকিয়ে বিক্রিযোগ্য হিং বের হয়, যার রঙ গাঢ় হলুদ। আমার যেহেতু হিং-এর আঠা বিক্রির বাসনা নেই, আমি গাছ কাটতে যাচ্ছি না।

হিং-এর বোটানিক্যালি নাম *Ferula foetida* Regil. হিং-এর পরিবার Umbellifereae. এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত বিপুল আয়োজনের গ্রন্থ *Medicinal Plants of Bangladesh*-এ হিং-এর উল্লেখ নেই। সম্ভবত এই গাছ বাংলাদেশের নয় বলেই। তবে ড. তপন কুমার দে'র লেখা *বাংলাদেশের প্রয়োজনীয় গাছ গাছড়ায়* হিং-এর উল্লেখ আছে। তিনি বলছেন, বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে পরীক্ষামূলকভাবে এই উদ্ভিদের চাষ হচ্ছে। উনার কথা ফেলে দেয়া যাবে না। কারণ তিনি বন বিভাগের বড় একজন কর্মকর্তা। 'বনের রাজা'র কাছাকাছি পদের মানুষ। তাঁর লেখা বইটি অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে।

ঔষধি ব্যবহার

ড. তপন কুমার দে বলছেন— 'হিং হিস্টোরিয়া রোগ নিবারক, স্নায়ুবিক উত্তেজক।' আমার প্রশ্ন, হিস্টোরিয়া স্নায়ুবিক উত্তেজনাতেই হয়। যে ওষুধ স্নায়ুবিক উত্তেজক সেই ওষুধ হিস্টোরিয়া আরো বাড়াবে। কমাবে কেন? না-কি বিষে বিষক্ষয়ের ব্যাপার?

হিং পেট ফাঁপায় খিচুনিতে খুবই কার্যকর। শিশুদের ব্রংকাইটিস এবং নিউমোনিয়া উপকারী এপিলেপ্সিতেও ব্যবহার করা যায়। শ্বাসযন্ত্র এবং স্নায়ুতন্ত্রে হিং উত্তেজক ওষুধ।

শিবকালী তাঁর বইতে লিখছেন, 'হিং কাঁচা খেলে মহিলাদের গর্ভপাতের সম্ভাবনা।' কাজেই মহিলারা সাবধান।

গাছপালা-বিষয়ক শুকনা (?) বিষয় নিয়ে আমার লেখাগুলি পাঠক-পাঠিকারা পড়ছেন বলে মনে হয় না। যারা পড়েছেন তাদের হয়তো ইতোমধ্যে ধারণা হয়েছে, ভেষজ বৃক্ষের ঔষধি গুণের উপর আমার অসম্ভব আস্থা। তা কিন্তু না। বর্তমান বিজ্ঞান কঠিন পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিজ্ঞান। প্রাচীন ভেষজবিদরা কী ধরনের পরীক্ষা করেছেন তা জানা নেই। তাদের অনেক ঔষধি বিজ্ঞানই অনুমান নির্ভর বলে আমার ধারণা। একটা উদাহারণ দেই। ভেষজবিদদের সবাই আনারস খাবার পরে দুধ খাওয়া সম্পূর্ণ নিষেধ করেছেন। তাদের ধারণা দু'য়ে মিলে মহা বিষ তৈরি হয়, যাতে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। আমি অনেকবার

ভরপেট আনারস খেয়ে দুধ খেয়ে প্রমাণ করেছি তথ্যটা মিথ্যা।

আনারস পর্তুগীজরা এদেশে নিয়ে এসেছিল। সম্পূর্ণ নতুন একটি ফল সম্পর্কে শংকা এবং ভীতি থেকে ভেষজবিদরা এই বিধান দিয়েছেন বলে আমার ধারণা। 'রাতে ফল খেতে হয় না', **'ফল খেয়ে জল খায় যম বলে আয় আয়'** এইসবই ভ্রান্ত ধারণা।

বরুন

গাছের নাম বরুন, সূর্যের নাম বরুন আবার শতভিষা নক্ষত্রের নামও বরুন। বরুন হিন্দুদের এক দেবতা, বর প্রার্থনা করলেই যিনি বর দেন। বরুন এমনই দেবতা যার কাছে অন্য দেবতারাও বর প্রার্থনা করেন—

'দেবাঃ প্রার্থয়ন্তে বরান ইতি বরুনঃ'

অর্থ, যার কাছে দেবতারা বর প্রার্থনা করেন তিনিই বরুন।

গাছটির বৈজ্ঞানিক নাম গ্রিক উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ক্রিটেভাসের নাম থেকে এসেছে— *Crataeva nurvala* Buch-Ham

পরিবার হলো Capparidaceae.

মাঝারি আকারের বহু শাখাযুক্ত বৃক্ষ। বাকলের রঙ ধূসর। শীতে সব পাতা ঝরে যায়। মার্চ-এপ্রিলে নতুন পাতা আসে। ফুল প্রথমে হয় সাদা, তারপর হয় হলুদ। সবশেষে হালকা লাল। গোলাকার ফল। ফুল এবং ফল সবজি হিসেবে অনেক জায়গায় রান্না করা হয়। বেসন দিয়ে ভাজা বক ফুল খেয়েছি। বরুন ফুল এখনো খাওয়া হয় নি। দেখি এবছর খাওয়া যায় কিনা। নুহাশ পল্লীর বরুন গাছ অনেক বড় হয়েছে। এই বছরে ফুল ফোটার কথা।

বরুন গাছের রসায়ন

গাছের ছালে আছে Saponin এবং টেনিন।

শিকড়ে আছে Lupeol, β sitosterol এবং varonol

ফলে আছে glucocapparin, beta-sitosterol, triacontane, triacontanol, cetyl এবং ceryl alcohol.

পাতায় আছে *l*-stachydrine

বরুন গাছের কাঠ দিয়ে দেয়াশলাই-এর কাঠি তৈরি হয়।

ভেষজ ব্যবহার

বরুন গাছের ছাল কিডনি এবং ব্লাডারের মহৌষধ হিসেবে বিবেচিত হয়। কিডনিতে এবং ব্লাডারে পাথর হতে দেয় না। বর্তমানের আধুনিক বিজ্ঞান এই কথা বলছে। আয়ুর্বেদ মতেও বলা হয়, কাণ্ড এবং মূলের ছাল পাথুরী রোগ নিবারক।

মেছেতা রোগটি ছত্রাকের কারণে হয় এবং সহজে এর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায় না। বরুন গাছের ছাল ছাগলের দুধে ঘষে প্রতিদিন মেছেতায় লাগালে মেছেতা সারবে।

গেঁটে বাতে গাঁটে গাঁটে ব্যথা হলেও বরুন পাতা পানিতে সেদ্ধ করে খেলে গেঁটে বাতের ব্যথা এবং ফোলা দুইই কমবে।

অর্শরোগে আক্রান্ত ব্যক্তি যখন ব্যথায় খুবই কষ্ট পাবে, তখন বরুন পাতা সেদ্ধ পানিতে তাকে গোসল করালে ব্যথা-বেদনা কিছুই থাকবে না।

নবম দশকের শেষে বাংলাদেশে বৃন্দ নামে একজন ভেষজবিদ জন্মেছিলেন। তার বিখ্যাত গ্রন্থ *সিদ্ধযোগ*-এ তিনি বরুন বৃক্ষের ছালের অনেক ব্যবহার দেখিয়েছেন। তার একটি হলো, ফোঁড়ায় বরুন গাছের ছাল বেটে লাগালে সঙ্গে সঙ্গে আরাম হবে।

তেলাকুচা

এক ভোরবেলায় জনৈক ভদ্রলোককে দেখলাম ভ্রু কুঁচকে নুহাশ পল্লীর ঔষধি বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাঁর হাতে কলম এবং একটা নোটবুক। মাঝে মাঝে নোটবুকে কী সব লেখাও হচ্ছে। আমি আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে গেলাম। ভদ্রলোক হতাশ গলায় বললেন, আসল গাছটাই তো আপনার এখানে নেই!

আমি বললাম, আসল গাছ কোনটা?

আসল গাছ হলো 'বিম্বী'। কী বাগান করলেন যেখানে বিম্বী নেই!

আমি বললাম, নামটা প্রথম শুনলাম।

ভদ্রলোক বললেন, বিম্বী হলো আমাদের দেশের তেলাকুচা। যার ফলের নাম মাকাল ফল। এখন চিনেছেন?

মাকাল গাছ আসল গাছ?

অবশ্যই। ডায়াবেটিসের যম। তেলাকুচার তিনটা পাতা নিবেন। আগুনের তাপে একটু গরম করে দুপুরে খাবার পর খাবেন। আপনার ডায়াবেটিস যদি না সারে, আমার একটা কান কেটে তেলাকুচা গাছের কাছে পুতে দিয়ে যাব।

আমি বললাম, সেখান থেকে 'কর্ণগাছ' বের হবার কোনো সম্ভাবনা কি আছে?

ভদ্রলোক বললেন, আমি শিক্ষক মানুষ। নিজে রসিকতা করি না। অন্যে যখন করে, সেটাও পছন্দ করি না। তেলাকুচা গাছ সম্পর্কে যা বলেছি ঠিকই বলেছি। বইপত্র পড়ে দেখবেন। গাছ বিষয়ে কিছু জানেন না, বাগান বানিয়ে বসে আছেন!

ভদ্রলোক চলে যাবার পর আয়ুর্বেদাচার্যের বই খুললাম। সেখানে সত্যি সত্যি লেখা—

'অনেক সময় আমরা মন্তব্য করি, তেলাকুচার পাতার রস খেলাম, আমার ডায়াবেটিসের সুফল কিছুই হলো না। একটা বিষয়ে যোগে ভুল হয়ে গিয়েছে। এই রোগ তো আর একরকম দোষে জন্ম নেয় না। এক্ষেত্রে তেলাকুচার পাতা ও মূলের রস তিন চামচ করে সকালে ও বৈকালে একটু গরম করে খেতে হবে। এর দ্বারা রোগী তিন-চার দিনে সুস্থতা বোধ করবেন।'

তেলাকুচার বোটানিক্যাল নাম *Coccinia indica cogn.*

তেলাকুচা Cucurbitaceae পরিবারের গাছ।

লতানো গাছ। বাংলার ঝোপঝাড়ে অযত্নে অবহেলায় বড় হয়। এর ফল উজ্জ্বল লালবর্ণের। চকচক করতে থাকে। পাখিরা এই ফল আগ্রহ করে খায়। ভয়ঙ্কর তিতা বলে মানুষের খাওয়ার অযোগ্য। মাস্টার সাহেবরা এই ফল গালাগালি করতে ব্যবহার করেন। কোনো ছাত্র যদি দেখতে সুন্দর হয় কিন্তু পড়াশুনায় হয় গাধা তাহলে তাকে শুনতেই হবে— ব্যাটা মাকাল ফল!

প্রাচীন কবিরা প্রণয়িনীর রূপ বর্ণনায় এই ফল ব্যবহার করেন। বিম্বোষ্ঠ শব্দটি ওষ্ঠ বিম্বের মতো তুলনায় অনেকবার ব্যবহার হয়েছে। সংস্কৃত কবি লিখলেন—

'বিম্বাধরাজ্ঞনৈ বিম্বে গুঞ্জা ফলমিতি ভ্রমাৎ'।

তেলাকুচার রসায়ন সম্পর্কে বলি— তেলাকুচার পাকা ফলে আছে Carotenoids. কাঁচা ফলে আছে Glycoside, Cucurbitacin B, Beta amyrin এবং Lupeol.

গাছটির মূলে আছে Lupeol acetate, Beta amgrin acetate এবং Beta sistosterol. মূলে আরো পাওয়া গেছে নতুন ধরনের Saponin, গাছের কাণ্ডে আছে Protein, Fat, Carbohydrates, Minerals, Vitamin c, Sterols, Beta sitosterol, Phenolic compounds, Triterpenoids, Beta-amyrin, Beta-amyrine acetate, Lupeol এবং তিক্ত Glycosidic ও alkaloids.

তেলাকুচার মতো গাছ নিয়ে এত গবেষণা যে হয়েছে তা জেনেছি ইন্টারনেটের মাধ্যমে। আধুনিক গবেষকরা বলছেন, এই গাছ ডায়াবেটিস সার তে সক্ষম।

যে শিক্ষক ভদ্রলোক বিম্ব গাছটির বিষয়ে আমাকে প্রথম জানিয়েছিলেন, মাসখানিক পরে তাঁর সঙ্গে আবার দেখা। তিনি একটি তেলাকুচার চারা নিয়ে এসেছেন। চারাটি যত্ন করে লাগানো হয়েছে। একটু বড় হলেই আমি এর পাতা খেয়ে ডায়াবেটিস সারাবো বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

করমচা

বিভূতিভূষণের '*পথের পাঁচালী*'তে চলে যাই। ঝম বৃষ্টি নেমেছে। অপু-দুর্গা বৃষ্টিতে ভিজছে। বৃষ্টি কমার জন্যে তারা একমনে জপছে—

'যা বৃষ্টি ধরে যা
নেবুর পাতায় করমচা।'

'নেবুর পাতায় করমচা' বলা হচ্ছে, কারণ এই গাছের পাতা লেবুপাতার মতো। ফুল সাদা, দেখতে জুঁই ফুলের মতো।

এই হলো আমাদের অতি পরিচিত করমচা। সংস্কৃত নাম করমর্দক। শিবকালীর বইতে করমচা বিষয়ে মজার তথ্য পেয়েছি। খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে কিছু ফলের ওপর ট্যাক্স বসেছিল। ফলগুলি হলো— তেঁতুল, আম, ডালিম, ফলসা, বড়ই, আমলকী, লেবু এবং করমচা। প্রাচীন ভারতে করমচা দিয়ে মদ বানানো হতো। এই ফলে চিনি নেই বললেই হয়, তারপরেও মদ কীভাবে বানানো হতো কে জানে। আমার ধারণা মদ তৈরির বিশেষ কোনো উপাদান হিসেবে এর ব্যবহার ছিল। বৈদিক শ্লোকে আছে— 'আমার কাঁচা, পাকা ও শুকনো ফল দ্রাক্ষা ফলের মতো পৃথক শক্তির আধার।'

করমচার বোটানিক্যাল নাম *Carissa carandus* Linn. পরিবার হলো Apocynaceae. নওয়াজেশ আহমেদ '*বাংলার বনফুল*' বইতে বলছেন করমচার ১৫টি প্রজাতি আছে। গুল্ম যেমন আছে, বৃক্ষ আছে, লতানো গাছও আছে।

এবার এই গাছের রসায়নে আসা যাক।

এই গাছের মূলে আছে চারটি Cardioactive compounds : Carissone, Beta-Sitosterol, Triterpene এবং Carindone. এছাড়াও আছে লিগনাম এবং স্টেরয়েড গ্লাইকোসাইড। থাইল্যান্ডের এক বিশ্ববিদ্যালয় (মহীফোল ইউনিভার্সিটি) করমচার মূলের উপর ব্যাপক গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে।

করমচার ফলে আছে প্রচুর পরিমাণে Ascorbic acid এবং Salicylic acid.

গাছটির কাণ্ডে আছে Alkaloid, Terpenoids এবং Steroidal glycosides.

ব্যবহার

আধুনিক পরীক্ষায় দেখা গেছে গাছের মূল Histamins releasing.

Hypotensive, Cardiotonic, Antiscorbic এবং anthalmintic. ফল Astringent এবং Antiscorbic.

প্রাচীন ভেষজে এই গাছের উল্লেখযোগ্য কোনো ব্যবহার পাচ্ছি না। অরুচিতে, পিত্তবিকারে ব্যবহার আছে।

সবচে' মজার ব্যবহার হলো 'হাই তোলা' রোগে। যারা বারবার হাই তোলেন, তারা করমচা সেদ্ধ পানি খেয়ে হাই তোলা রোগ সারাতে পারেন। অক্সিজেনের ঘাটতি হলে আমরা হাই তুলি বলে জানতাম, আয়ুর্বেদশাস্ত্রীরা এই বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেন। তাদের মতে 'হাই' হলো সর্বশরীর ব্যাপী সঞ্চরণশীল বায়ু (ধাতুগত অগ্নিপ্রবাহ)।

অপু-দুর্গার কাছে করমচার ব্যবহার বৃষ্টি কমানোয়। আমি এই ফল টক স্বাদের জন্যে খাই। বাংলাদেশের কিছু নার্সারি মিষ্টি করমচার বিদেশী চারা বিক্রি করছে। নুহাশ পল্লীতে এরকম একটা চারা আছে। তার পাকা ফল খেয়ে দেখেছি, দেশী করমচার চেয়েও টক!

পপি

ব্রিটিশরা চীনের সঙ্গে দু'বার যুদ্ধ করেছে শুধুমাত্র 'আফিম'-এর ব্যবসা সমস্যা নিয়ে। প্রথমবার ১৮৪১ সনে। দ্বিতীয়বার ১৮৫৮ সনে। দু'বার চীন পরাজিত হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি চীনে আফিম রপ্তানির একচ্ছত্র অধিকার লাভ করে। এই আফিম যেত ভারতবর্ষ থেকে। কোম্পানির তত্ত্বাবধায়নে আফিম গাছের চাষ হতো। আফিম সংগ্রহ করে রপ্তানি করা যেত।

আমি যখন খুব ছোট (বয়স ৫-৮ বছর) তখন দেশের বিভিন্ন জায়গায় আফিম বিক্রির দোকান দেখেছি। আফিমখোররা দোকান থেকে আফিম কিনতেন। তবে তার জন্যে লাইসেন্স করতে হতো। মাদক গ্রহণের জন্যে লাইসেন্স প্রথা এখনো বাংলাদেশে আছে। সরকারের আবগারী বিভাগ সমাজের বিশিষ্টজনদের মদ খাবার জন্যে লাইসেন্স (!) দেন।

মোঘল রাজপরিবারের সদস্যদের আফিমের নেশা ছিল অতি পছন্দের নেশা। বঙ্গ সমাজেও আফিম খেয়ে নেশা করার সামাজিক স্বীকৃতি ছিল। বয়স্করা সন্ধ্যার পর আফিমের একটা 'গুলি' খেয়ে মৌতাত করবেন, এতে কেউ দোষ ধরত না।

গত ত্রিশ হাজার বছর ধরে মানুষ এই ভয়ঙ্কর নেশা করে যাচ্ছে। তবে এখন 'গেল গেল' রব উঠেছে। আফিমের নানা উপাদানের নানা ব্যবহার তারপরেও বের হচ্ছে। বিশুদ্ধ এইসব উপাদানে 'হুকড' হয়ে যাওয়া জনগোষ্ঠীর সামনে গাঢ় অন্ধকার ছাড়া কিছুই নেই।

যে গাছটির থেকে এই আফিম তৈরি হচ্ছে, তার নাম পপি। প্রতিবছর ফুলের সৌন্দর্যের জন্যে নুহাশ পল্লীসহ সারা পৃথিবীতেই এই গাছের চাষ করা হয়। বর্ষজীবি এই গাছে শীতের সময় অদ্ভুত সুন্দর ফুল ফোটে। ফুলের পাপড়ি লালচে, গোলাপি, নীলচে, গাঢ় নীল বর্ণের হয়। ফলগুলি হয় ক্যাপসুলের মতো। ফল ব্লেড দিয়ে লম্বালম্বিভাবে চিরে দিলে সেখান থেকে সোনালি রঙের আঠা বের হয়। এই আঠা রোদে শুকিয়ে আফিম বানানো হয়। ফলের বীজগুলি কিন্তু আমরা তরকারি হিসেবে ব্যবহার করি। বীজের নাম পোস্তদানা। বাংলা রান্নার যে-কোনো বইয়ে পোস্তদানার উল্লেখ থাকবেই।

বীজগুলি বাজারে সরাসরি আসে না। পানিতে ফলসহ বীজ একবার সেদ্ধ হয়ে আসে। সেই সেদ্ধ পানিও নেশা হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ফলের

খোসাগুলিও বিক্রি হয়। খোসার নাম পোস্তঢেঁড়ী।

গাছটির বোটানিক্যাল নাম *Papaver somniferum* Linn.

পরিবার— Papaveraceae.

আফিমে যেসব বিষাক্ত বস্তু থাকে তার মধ্যে আছে ১.৫ ভাগ মরফিন, ০.৫ ভাগ নারকোটিন, ০.১ ভাগ কোডেইন, ০.১ ভাগ পেপাভারেন, ০.৫ ভাগ থিবেইন। আফিমের ত্রিশটি প্রজাতি থেকে পেপাভিরুবিনস জাতীয় একশ'র বেশি এলকালয়েডস পাওয়া গেছে। (সূত্র : *বিষাক্ত গাছ থেকে সাবধান*, প্রশান্ত কুমার ভট্টাচার্য)

আরবের মহান চিকিৎসক ইবনে সিনা তাঁর বিভিন্ন গবেষণাগ্রন্থে মানসিক এবং শারীরিক অসুখ আরোগ্যের ওষুধ হিসেবে আফিমের ব্যবস্থা দিয়েছেন। হোমার তাঁর *ইলিয়াড* মহাকাব্যে আফিমকে ব্যথা উপশম এবং ক্ষত নিরাময়ের ওষুধ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ভারতীয় ভেষজে যকৃতের ব্যথায় আফিম ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে।

স্নায়ুঘটিত রোগ, বহুমূত্র, একশিরা, অনিদ্রায় এর ব্যবহারের বিধান দেয়া হয়েছে।

আফিমের যে ব্যবহার জেনে আমার মজা লেগেছে, তা হলো— ইচ্ছাশক্তি বর্ধক হিসেবে ব্যবহার। ভারতীয় যোগীরা দুধের সঙ্গে নিয়মিত সামান্য মাত্রায় আফিম খেয়ে থাকেন। এতে ইচ্ছাশক্তি, নিজের মনের ওপর দখল না-কি বাড়ে।

আফিমের ঔষধি গুণাবলি সব জেনেও বলছি, এই ভয়ঙ্কর গাছ থেকে 'শত হস্ত দূরেৎ' শত হস্ত দূরে থাকাই বাঞ্ছনীয়।

উদয়পদ্ম

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ত্রিপুরার মহারাজার বাড়িতে প্রথম এই গাছ দেখেন। বিদেশী গুল্মজাতীয় গাছ। অপূর্ব ফুল। এ বি এম জাওয়ায়ের হোসেন অবশ্যি তাঁর বই *ঔষধি গাছগাছড়া*য় লিখেছেন এটি একটি বৃক্ষ। ২০ থেকে ২৫ ফুট লম্বা হয়। রবীন্দ্রনাথ এই গাছের কোনো বাংলা নাম নেই দেখে নিজেই নাম রাখেন উদয়পদ্ম।

উদয়পদ্ম নুহাশ পল্লীতে আছে, বৃক্ষপ্রেমিকদের উদয়পদ্ম দেখার নিমন্ত্রণ।

গাছটির বোটানিক্যাল নাম *Magnolia grandiflora.* পরিবার Magnoliaceae.

গাছটির কোনো ঔষধি ব্যবহার কোথাও খুঁজে পাই নি। অপূর্ব ফুল মন ভালো করে দেয়। এটাই বা কম কী?

নীলমণি লতা

এই গাছের নামও রবীন্দ্রনাথের রাখা। নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে ফুলের রঙ নীল। অর্কিড ধরনের থোকা থোকা ফুল দেখে রবীন্দ্রনাথের মাথায় নীলমণি নাম আসাই স্বাভাবিক। লতাজাতীয় গাছ। ইংরেজিতে বলে Climber. নুহাশ পল্লীতে আছে।

নীলমণি লতার বোটানিক্যাল নাম *Patraea volobilis.* পরিবার হলো Verbenacea. একই পরিবারের একটি গাছ আছে সবাই চেনেন, গাছটার নাম রক্তাক্ত হৃদয়— Bleeding Heart.

নীলমণি লতার কোনো ঔষধি ব্যবহারের কথা জানা নেই।

মাধুরী লতা

এই গাছের নামও রবীন্দ্রনাথের রাখা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রিয় কন্যা মাধুরীর স্মৃতিতে গাছটার নাম রাখেন। অনেকে মাধুরী লতাকে মাধবী লতা বলে ভুল করেন।

গাছটা লতাজাতীয় (Climber), বোটানিক্যাল নাম *Quisqualis indica.* পরিবার Combretaceae.

লতানো এই দৃষ্টিনন্দন ফুল গাছের কোনো ঔষধি ব্যবহার নেই।

বাগান বিলাস

বাগান বিলাস গাছের নামও রবীন্দ্রনাথের রাখা। আদি নাম বুগেনভিলিয়া। প্রধান প্রজাতি তিনটি— পেরুভিয়ান, গ্লাবরা এবং স্পেক্টাবিলিস। বাংলাদেশে সবকটি প্রজাতি আছে। 'Bougain villea' কি এই গাছের ইংরেজি নাম, নাকি বোটানিক্যাল নাম বুঝতে পারছি না। ঔষধি কোনো ব্যবহারও খুঁজে পাই নি। যেসব গাছের নাম রবীন্দ্রনাথ রেখেছেন সেই গাছগুলি সম্পর্কেই পরপর লিখলাম। কিছু গাছের বোটানিক্যাল নাম হিসেবে রবীন্দ্রনাথ এবং বিভূতিভূষণের নাম এলে ভালো লাগত— Tagore indica, Bivhuti indica। পড়তেই ভালো লাগে।

জবা

মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে একটা ছবি বানিয়েছিলাম। ছবির নাম 'শ্যামল ছায়া'। ছবির এক ব্রাহ্মণ চরিত্র স্নানের সময় সূর্যমন্ত্র পাঠ করল—

'জবাকুসুম সংকাশং কাশ্যপেয়ং মহা দ্যুতিং...'

বোঝাই যাচ্ছে জবা কোনো সহজ ফুল না। সূর্যপ্রণাম জবাফুল ছাড়া হবে না। মা-কালীর পূজাতেও জবাফুল লাগবে। সাধারণ জবায় হবে না, রক্তজবা লাগবে। কাপালিকদের প্রিয় ফুল জবা। এই ফুলকে তাঁরা বশিকরণ এবং মারণ কার্যে ব্যবহার করতেন বলে ভারতীয় সংস্কৃত গ্রন্থে উল্লেখ পাওয়া যায়। [সূত্র : আয়ুর্বেদাচার্য শিবকালী।]

জবার বোটানিক্যাল নাম *Hibiscus rosa-sinensis* Linn. পরিবার Malvaceae. জবা মানেই লাল, অথচ এখন নানান বর্ণের জবা দেখছি। নুহাশ পল্লীতে দুধের মতো সাদা রঙের জবাও আছে। গবেষণায় নানান পদ্ধতিতে ফুলের রঙ বদলানো এখন কোনো ব্যাপারই না। কুঁচকুঁচে কালো রঙের গোলাপ পাওয়া গেলে সাদা জবা দোষ করল কী?

পৃথিবীর পাঁচটি দেশের জাতীয় ফুল জবা।

জবার রসায়ন

জবাফুলে আছে— Thiamine, Riboflavin, Niacin এবং Ascorbic acid, Cyanidin, digroside, Flavonoids.

পাতা এবং গাছে আছে— Beta sistosterol, Stigmasterol, Taraxerol acetate. কিছু Cyclopropane এবং তাদের Derivatives-ও পাওয়া গেছে।

জবার ব্যবহার

ভেষজ ওষুদের ভারতীয় গ্রান্ডমাস্টার যেমন চরক, সুশ্রুত, বাগভেট জবার ব্যাপারে কিছু বলেন নি। সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত ভারতীয় কোনো গ্রন্থে জবার ঔষধিগুণের উল্লেখ নেই। একাদশ শতাব্দীতে চক্রদত্ত জবার ভেষজ ব্যবহারের কথা বলেন।

- অনিয়মিত মাসিক স্রাবে : জবাফুল বেটে কয়েকদিন খেতে হবে।
- চুলে ফাংগাস ইনফেকশন : জবাফুল বেটে লাগাতে হবে। এলোপেসিয়া এরিয়েটা

- চোখ উঠায় : জবাফুল বেটে চোখের উপরের এবং নিচের পাতায় লাগাতে হবে।

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান জবার কিছু গুণ আবিষ্কার করেছে, যেমন—

- জবার শিকড় যৌনউত্তেজক (aphrodisiac) এবং রাতকানা রোগে কার্যকর।
- চোখের অসুখেও জবার পাতার রস কার্যকর।
- পাতার নির্যাস বাতের ভালো ওষুধ। ফেরিনজাইটিস এবং টনসিলাইটিসেও খুব কার্যকর।

ঘৃতকুমারী

এই লেখাটা কুইজ দিয়ে শুরু করা যাক। বৃক্ষবিষয়ক কুইজ।

বলুন তো, আদম এবং ইভ যে গাছটির পাতা দিয়ে লজ্জা নিবারণ করেছিলেন সেই গাছের নাম কী?

আমি নিশ্চিত বেশিরভাগ পাঠকই ভ্রু কুঁচকাচ্ছেন। গাছের নাম তাদের জানা নেই। নাম বলে দিচ্ছি। গাছটির নাম 'উদ'। উদ নাম সহজে মনে থাকবে না। উট মনে রাখলেই উদ মনে পড়বে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন, 'উদ' বেহেশতের গাছ, পৃথিবীতে কি এই গাছ আছে?

প্রশ্নটির জবাব না দিয়ে 'ঘৃতকুমারী'তে চলে যাই।

বেদে তরুণীকে বলা হয়েছে 'ঘৃতকুম্ভ সমা নারী।' যার অর্থ সামান্য তাপেই এরা গলে যান। ঘৃতকুমারী নাম সেখান থেকেই এসেছে। এই গাছের পাতাও সামান্য চাপ এবং তাপে গলে যায়। গাছটির আরেক নাম গৃহকন্যা, কারণ গৃহের আশেপাশেই তার বাস। কেউ কেউ বলেন 'অমরা', গাছটি বহুবর্ষজীবি— প্রায় মৃত্যুহীন। আরবিতে এই গাছের নাম 'সব্বাতর'। ইংরেজিতে Aloe.

> 'In lands of palm and southern pine;
> In lands of palm, of orange blossom,
> Of olive, aloe, and maize and vine.'
>
> — Tennyson

ঘৃতকুমারী না চিনলেও Aloe নামটির সঙ্গে আমাদের তরুণীদের পরিচয় আছে। তারা মুখের ত্বকের যত্নে দামি দামি যেসব লোশন ব্যবহার করেন, তাদের বেশিরভাগের ইনগ্রেডিয়েন্টের একটা Aloe.

গাছটার বোটানিক্যাল নাম *Aloe indica royle*. Indica বলছে গাছটির মাতৃভূমি ভারতবর্ষে। যদিও নওয়াজেশ আহমেদ বলছেন, গাছটি এসেছে মাদাগাস্কার দ্বীপ থেকে। ঘৃতকুমারী Liliaceae পরিবারভুক্ত।

রসায়ন

এলোইন হলো ঘৃতকুমারীর প্রধান রাসায়নিক উপাদান। এলোইনের প্রধান উপাদানগুলি হলো বার্বালাইন, আইসো বার্বালাইন, বিটা বার্বালাইন এবং এলো এমোডিন। এলোইন ছাড়াও আরো যেসব গুরুত্বপূর্ণ যৌগের সন্ধান পাওয়া গেছে,

সেসব হচ্ছে— ফ্লাভোনয়েডস, অক্সানথ্রোকুইনোনস, কুমারিন, এমিনো অ্যাসিড, স্টেরল, ট্রাইটারপেন, ম্যালিক এবং ফরমিক অ্যাসিড। গাছটিতে কিছু উদ্বায়ী তেল এবং রজনও আছে।

ব্যবহার

পশ্চিমা দেশে ঘৃতকুমারী নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। ঘৃতকুমারীর ঔষধি গুণ সম্পর্কে তাদের কথা বলা যাক।

- ঘৃতকুমারীর পাতার রস ক্ষত এবং পুড়ে যাওয়া অতি দ্রুত সারায়। এই রস পেপটিক আলসার, ডায়াবেটিস এবং অ্যাজমার ওষুধ। রস ঘন করে খেতে হবে। ঘৃতকুমারীর রস ঘন করে যে বস্তু তৈরি হয় তার আয়ুর্বেদিক নাম মুসাব্বর।
- মেয়েদের ঋতুজনিত সমস্যা এবং লিউকোরিয়াতে মুসাব্বর অত্যন্ত উপকারী।

টেকোদের জন্যে সুসংবাদ

ঘৃতকুমারী ব্যবহারে টেকো মাথায় চুল গজায়। প্রাচীন ভেষজবিদদের কথা নয়, পশ্চিমা গবেষকদের কথা— (Coldman and Coldman, 1996)। যারা টেকো মাথার অধিকারী, তারা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

মৃত্যুফুল

নাম শুনলেই চমকাতে হয়। না জানি কী ভয়ঙ্কর ফুল। অথচ এই ফুল আমাদের গ্রামেগঞ্জে, শহরের বাড়ির টবে সারা বছর ফুটে থাকে। আমাদের অতি পরিচিত এই ফুলের নাম 'নয়নতারা'। প্রাচীন গ্রিসের অধিবাসীরা এই ফুলের নাম দিয়েছিল 'মৃত্যুফুল'। কারণ তাদের একটা নিয়ম ছিল, যে সব শিশু মারা যাবে তাদের গলায় পরিয়ে দিতে হবে নয়নতারার মালা। অর্থাৎ মৃত্যুফুলের মালা।

অবাক কাণ্ড হচ্ছে, জার্মানিতে একই ফুলের নাম অমরত্বের পুষ্প (Flower of immortality), আরেক নাম শতচক্ষু (Centochio). শতচক্ষু নাম কেন হলো বুঝতে পারছি না। বাংলা নয়নতারার সঙ্গে শতচক্ষুর মিল আছে। ঝোপড়ি ধরনের গাছে যখন অসংখ্য ফুল ফোটে, তখন মনে হয় অসংখ্য চোখ তাকিয়ে আছে। শতচক্ষু নাম কি সেখান থেকে এসেছে?

ইংরেজিতে এই ফুলের নাম Periwinkle. কবি Wordsworth-এর কবিতায় Periwinkle উঠে এসেছে।

'Through primerose tufts in that sweet bower
The fair periwinkle trailed its wreaths.'

গাছটির বোটানিক্যাল নাম *Vinca rosea* Linn. পরিবার Apocynaceae.

নয়নতারার ফুলে পাঁচটি পাপড়ি থাকে। পাপড়ির রঙ গোলাপি। বাংলাদেশে গোলাপি ছাড়াও সাদা এবং লাল রঙের নয়নতারাও দেখা যায়। ইউরোপে আমি দেখেছি নীল রঙের নয়নতারা।

নয়নতারার ঔষধি ব্যবহার তার পাতা এবং মূলে। গাছের রসে ৭০টির মতো Alkaloids আছে। ভিনক্রিস্টিন ও ভিন ব্লাস্টিন নামের দু'টি যৌগ লিউকোমিয়া রোগের ওষুধ হিসেবে ব্যবহার হয়। বিদেশী বিজ্ঞানীরা নয়নতারা নিয়ে ব্যাপক গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। লিউকোমিয়া একটি ভয়াবহ ব্যাধি। প্রাচীন আয়ুর্বেদশাস্ত্রীরা এর নাম দিয়েছেন রক্তবাহী ব্যাধি। তারা নয়নতারা গাছের রস পানের বিধান তখনি দিয়েছেন। আধুনিক গবেষণায় প্রমাণিত হলো তাদের বিধান ঠিক ছিল।

ডায়াবেটিসে নয়নতারার পাতা (সাদাফুল)-কে অব্যর্থ ওষুধ হিসেবে বলা হয়েছে। ভোরবেলা বাসি পেটে দু'টা পাতা চিবিয়ে খেলে রোগ থাকবে নিয়ন্ত্রণে। যারা ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে সকাল বিকাল হেঁটে কুল পাচ্ছেন না, তারা এই চিকিৎসা করে দেখতে পারেন।

বকফুল

বাংলা নাম বকফুল, ইংরেজি নাম Bakful। অদ্ভুত না? ঝাঁকড়া ধরনের গাছ, দ্রুত বাড়ে। দ্রুত ফুল দেয়। যখন ফুল ফোটে, মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকতে হয়। ফুল দেখতে বকের ঠোঁটের মতো, তাই নাম বকফুল। দৃষ্টিনন্দন এই ফুলের আরো ব্যবহার আছে। কুমড়া ফুলের মতো এই ফুলের বড়া খাওয়া হয়। অতি স্বাদু। আমার পছন্দের খাবারের তালিকায় বকফুলের বড়া আছে। ফুল ফোটে সেপ্টেম্বর-নভেম্বরে। নুহাশ পল্লীর একটি গাছে অবশ্যি গরমকালেও ফুল ফুটতে দেখেছি। হয়তো এই গাছ বৃক্ষ জগতের নিয়মকানুন মানে না।

নুহাশ পল্লীতে সাদা এবং লাল দু'ধরনের বকফুল আছে। লাল বকফুলের গাছে এখনো ফুল ফোটে নি। ফুল দেখতে কেমন (এবং খেতে কেমন) বলতে পারছি না। বৃক্ষবিশারদরা বলছেন এই গাছের আদিবাস থাইল্যান্ড। থাইল্যান্ডে এই গাছের নাম 'খাই কাউ'। থাইরা এই গাছের শুধু যে ফুল খায় তা-না, গাছের পাতাও সবজির মতো খায়।

সাধারণত দেখা যায় মানুষ যে সব গাছের পাতা সবজি হিসেবে খায়, গরু-ছাগল সে সব পাতা খায় না। বকফুল গাছ তার ব্যতিক্রম। এর পাতা গরু-ছাগলের খুব পছন্দ। *ত্রিপুরার গাছপালা* বইতে নলিনীকান্ত চক্রবর্তী লিখছেন, 'গাছের কচি ডাল ও পাতা উত্তম পশুখাদ্য।' জাভাতে পশুখাদ্যের জন্যে এই গাছের চাষ করা হয়।

বকফুলের কাণ্ড নরম। অনেক দেশে দ্রুত বর্ধনশীল এই গাছ কাগজের মণ্ড তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। কাগজের মণ্ড তৈরিতে আমরা বাঁশ ব্যবহার করি। বিকল্প চিন্তা কি করা যায় না?

গাছের বোটানিক্যাল নাম *Sesbania grandiflora*. 'Sesbania' শব্দটি আরবি থেকে নেয়া। গোত্রের নাম Leguminosae.

রসায়ন

বকফুলের গাছে এবং বীজে আছে ফ্যাসফেরোল, ভিটামিন সি এবং স্যাপোনিন।

পাতায় প্রায় ৩৩ শতাংশ প্রোটিন, প্রচুর খনিজ লবণ এবং ভিটামিন আছে।

ভেষজ ব্যবহার

- সর্দি-কাশি : সর্দি যদি জমে কঠিন হয়ে যায়, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট শুরু হয়, তখন বকফুলের রস ১ চা-চামচ করে দিনে দুই থেকে তিনবার খাওয়াতে হবে।
- গুটিবসন্তে : গুটিবসন্তে বকফুলের রসের ব্যাপক ব্যবহার ছিল। পৃথিবী থেকেই গুটিবসন্ত উঠে গেছে, কাজেই বকফুলের এই ভেষজ ব্যবহার এখন অর্থহীন।
- নেজাল এলার্জিতে : আমরা নাকের এলার্জিতে নানা ধরনের নেজাল ড্রপ ব্যবহার করি। বিকল্প চেষ্টা হিসেবে বকফুলের রস নাকে টেনে দেখা যেতে পারে। প্রাচীন বৈদ্যরা এমন বিধান দিয়েছেন।

ওলট কম্বল / শয়তানের তুলা

ওলট কম্বলের ইংরেজি নাম Devils cotton— শয়তানের তুলা। নামকরণের শানেনজুল থাকা উচিত। আমি অনেক চেষ্টা করেও শয়তানের তুলার সঙ্গে গাছের কোনো সম্পর্ক বের করতে পারি নি। ওলট কম্বলের তাও একটা অর্থ পাওয়া যায়, এর জীবকোষ দেখে মনে হবে কম্বল কেটে তৈরি হয়েছে।

ছোট অবস্থায় গাছটা দেখতে স্থলপদ্মের মতো। খুব যে বড় হয় তাও না। ৭ থেকে ৮ ফুট। এই গাছের গোড়া কেটে পানিতে পচতে দিলে পাটগাছের মতো আঁশ পাওয়া যায়।

এই গাছের ফুল মেরুন কিংবা উজ্জ্বল বেগুনি। দেখতে অতি অদ্ভুত। মনে হয়— ফুল না, রঙিন প্রজাপতি বসে আছে। অন্য কোনো ফুলের সঙ্গে সামান্যতম মিলও নেই। ফুল ফোটে আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে। পাঁচ কোণ বিশিষ্ট ফল ফলে। সেই ফলও অদ্ভুত।

গাছটার বোটানিক্যাল নাম *Abroma augusta* Linn. পরিবারের নাম Sterculiaceae.

প্রাচীন ভেষজ চিকিৎসা গ্রন্থে কোথাও ওলট কম্বলের নাম নেই। বাংলাদেশ জাতীয় আয়ুর্বেদিক ফর্মুলারীতে (১৯৯২) এর উল্লেখ মাত্র নেই। অবশ্যি আয়ুর্বেদাচার্য শিবকালী ভট্টাচার্য খুঁজে পেতে এক পুঁথিতে পেয়েছেন—

'ওলট কম্বল মিত্যাঘ্যং বনং বনেচরেং প্রিয়ম'

যার অর্থ ওলট কম্বলের ঔষধি গুণ বনবাসীদের কাছে জ্ঞাত ছিল। তারা প্রকাশ করে নি। ঔষধি গুণ লুকিয়ে রাখার প্রবণতা সব কালচারেই ছিল। এখনো আছে।

আমার দাদাজান মরহুম আজিমুদ্দিন আহমেদ কামেলা বা জন্ডিসের একটা টোটকা জানতেন। অনেক অনুরোধেও তিনি তা প্রকাশ করেন নি। তিনি তাঁর জ্ঞান মৃত্যুর সময় সঙ্গে নিয়ে গেছেন। পরকালে জন্ডিস রোগ থাকলে তাঁর বিদ্যা হয়তো কাজে লাগবে। এই গাছটির ঔষধি গুণের কথা প্রথম বলেন ভুবন মোহন সরকার। *Indian Medical Gazette* (১৮৭২)-এ তিনি এই তথ্য প্রকাশ করেন। (সূত্র : *বাংলার বনফুল*, নওয়াজেশ আহমেদ)

গাছের রসায়ন

ওলট কম্বলের পাতায় আছে Taraxerol এবং Beta sitosterol. ছালে আছে Alkaloids, Sterols, Gum, কিছু ম্যাগনেসিয়াম লবণ। গাছের কাণ্ডে আছে Friedelin এবং Beta sitosterolbn.

ভেষজ ব্যবহার

- বার্ধক্য রোধে : পশ্চিমা দেশগুলিতে ageing বন্ধ করা অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। মুখের বলিরেখা বন্ধ করতে, ঝুলে যাওয়া চামড়া সবল করার জন্যে তারা যে-কোনো মূল্য দিতে প্রস্তুত। ওলট কম্বলের মূলের চূর্ণ গোলমরিচের গুঁড়া মিশিয়ে খেলে বার্ধক্য থমকে দাঁড়ায়। বার্ধক্যজনিত রোগ কাছে আসে না।
- স্ত্রী রোগে : মাসিকের অনিয়ম এবং স্বল্পতা কিংবা বৃদ্ধি। শ্বেতস্রাব এবং তার কারণে গর্ভসঞ্চার না হওয়ার ওষুধ ওলট কম্বল। অনুপাত্র গোলমরিচের গুঁড়া। ড. তপন কুমার দে বলছেন, ২০০ মিলিগ্রাম ওলট কম্বলের মূল চূর্ণের সঙ্গে এক টিপ নস্যি পরিমাণ গোলমরিচ সকাল-বিকাল খেতে। *(বাংলাদেশের প্রয়োজনীয় গাছ-গাছড়া)*

ওলট চণ্ডাল / অগ্নিজিহ্বা

ওলট কম্বলের কথা বলা হয়েছে। ওলট চণ্ডাল বাদ থাকে কেন ? ওলট চণ্ডাল, ওলট কম্বল— নাম শুনলে একই গোত্রের মনে হলেও এরা সম্পূর্ণ আলাদা। ওলট চণ্ডাল লতানো লিলি ফুলের গোত্রের গাছ। ইংরেজি নাম Glory Lily অর্থাৎ গৌরবময় লিলি। বাংলায় এবং সংস্কৃতে এর অনেক নাম আছে। আমার নিজের পছন্দ অগ্নিজিহ্বা। কারণ ফুলটা দেখতে আগুনের জিহ্বার মতোই।

নুহাশ পল্লীর বাগানে ওলট চণ্ডাল ছিল না। বৃক্ষমেলা থেকে একটি চারা জোগাড় করেছি। অতিরিক্ত যত্নের কারণেই হয়তো বেচারা মারা গেছে। ওলট চণ্ডাল বনেজঙ্গলে, ঝোপে-ঝাড়ে, বাড়ির পেছনে পতিত জমিতে অযত্নে জন্মে। এত আদরে সে হয়তোবা অভ্যস্থ না।

প্রাচীন ভেষজবিদরা সাতটি অতি বিষাক্ত গাছের উল্লেখ করেছেন। ওলট চণ্ডাল তার একটি। চণ্ডাল নামকরণের এও একটি কারণ হতে পারে।

ওলট চণ্ডালের বোটানিক্যাল নাম *Gloriosa superba.* গোত্র : Liliaceae.

আদি নিবাস নিয়ে মতভেদ আছে। ভারতের গাছ হতে পারে। তার তর দ্বীপপুঞ্জে (যেমন আন্দামান) প্রচুর দেখা যায়। থাইল্যান্ডের দ্বীপগুলিতেও আছে। এই গাছের থাই নাম 'দাওয়ে ডাং' (সূত্র : *বাংলার বনফুল*, নওয়াজেশ আহমেদ)।

রসায়ন

গাছের মূলে আছে কয়েক ধরনের নাইট্রোজেনগঠিত যৌগ (Alkaloids), কোলচানিন, গ্লোরিসিন, বেনজয়িক অ্যাসিড, ফাইটোস্টেরল এবং গ্লোকোসাইড। আমেরিকান বিজ্ঞানীরা গাছের মূলের ব্যাপারে উৎসাহ দেখাচ্ছেন। মূলের স্টেরল নিয়ে প্রচুর গবেষণা হচ্ছে।

ওষধি ব্যবহার

- গর্ভপাতে : বলা হয়ে থাকে এই গাছের মূল গর্ভপাতে অব্যর্থ। এই কারণেই ওলট চণ্ডালের আরেক নাম গর্ভপাতিনি।
- প্রসব হবার পর অনেক মায়ের জরায়ুতে ফুল থেকে যায়। সহজে বের হতে চায় না। ওলট চণ্ডালের মূল না-কি এই কাজে অব্যর্থ।

- **কুষ্ঠরোগ** : প্রাচীন ভেষজবিদরা এই গাছের মূলের প্রলেপ কুষ্ঠরোগাক্রান্ত জায়গায় লাগিয়ে ভালো ফল পেয়েছেন।
- **গনোরিয়া** : একসময় গনোরিয়া রোগে বিষাক্ত পারদ ব্যবহার হতো। ওলট চণ্ডালের বিষাক্ত মূলও একইভাবে কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে।
- **মাথার উকুন** : এই গাছের পাতার রসও মনে হয় বিষাক্ত। পাতার রস মাথায় মাখলে উকুনের ভুষ্টি নাশ ঘটে।

কিছুদিন আগে পত্রিকায় ছবি দেখেছি ভুবনখ্যাত এক মডেল মাথায় উকুনের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে মাথা কামিয়ে ফেলেছেন। ওলট চণ্ডালের পাতার রস ব্যবহার করলে বেচারির মাথায় সুন্দর চুলগুলি হয়তো থাকতো।

ওলট কম্বল

জবা

বিছুটি

বিলম্বী

বাগান বিলাস

সাদা রঙের বকফুল

নিম

পপি

উদয় পদ্ম

আম

বকুল (সদাপুষ্প)

বনকলা না-কি কলাপতি ?

আমার শৈশবের একটি অংশ কেটেছে পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবানে। আমি তখন পড়তাম ক্লাস সিক্সে। এই বয়সের একটি ছেলে যতটুকু দুষ্ট হওয়া সম্ভব, আমি ততটুকু দুষ্টই ছিলাম। স্কুল কর্তৃপক্ষ আমার দুষ্টামি সহজভাবে নেয় নি। এখন খুব পরিষ্কার মনে পড়ছে না— হয় তারাই আমাকে স্কুল থেকে বের করে দিল, কিংবা বাবাই আমাকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এলেন। আমি ঘরে বসে থাকি। আমার ছোট দুই ভাইবোন, সুফিয়া ও জাফর ইকবাল, শিষ্ট ছাত্র হিসেবে স্কুলে যায়। ঘরে আর কতক্ষণ থাকা যায় ? স্কুলের সময় আমি পাহাড়ি বনে-জঙ্গলে ঘুরতে শুরু করলাম। আমার সঙ্গী মুরং রাজপরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত ক্লাসের এক বন্ধু, নাম ওয়ালা প্রু বা এর কাছাকাছি।

ওয়ালা প্রু প্রায়ই পকেটভর্তি তেঁতুল নিয়ে যেত। জঙ্গলে কিছুটা কলাগাছের মতো দেখতে এক ধরনের গাছ খুঁজে বের করত। সেই গাছে কড়ে আঙুল সাইজের কলা ধরে থাকত। কলার থোড়টা থাকত আকাশের দিকে উঁচু হয়ে। ওয়ালা প্রু এবং আমি কড়ে আঙুল সাইজের কলা খোসা ছড়িয়ে তেঁতুল দিয়ে খেতাম। কলার কষে মুখ ঝাঁঝাঁ করত। তেঁতুল দিয়ে এই বস্তু কোনো এক বিচিত্র কারণে অমৃতের মতো লাগত।

অনেক দিন পর ঐ গাছ কয়েকটা দেখলাম বৃক্ষমেলায়। দোকানি 'কলাপতি' নামে বিক্রি করছে। চারটা গাছ কিনে নুহাশ পল্লীতে লাগিয়ে কিছুক্ষণের জন্যে হলেও শৈশবে ফিরে যাবার বিরল সৌভাগ্য হয়েছিল।

যাই হোক, এই গাছের বোটানিক্যাল নাম *Musa ornata*. পরিবার হলো Musaceae. ইংরেজি নাম Wild banana, বুনো কলা। বার্মা এবং থাইল্যান্ডের জঙ্গলে প্রচুর ফলে। বার্মিজ নাম ইয়াকায়িং, থাই নাম কুয়াইবুয়া। আদি নিবাস না-কি দক্ষিণ আমেরিকা।

এই গাছ সম্পর্কে একটাই তথ্য দিতে পারছি। এর থোড় এবং কলা পাহাড়িরা সবজি হিসেবে আগ্রহ করে খায়। আকাশমুখী এই থোড় দেখতে অপূর্ব এক ফুলের মতো। মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে দেখার মতো।

আম

আমার শৈশবের একটি বছর কেটেছে আমবাগানের ভেতর।

বাবার পোস্টিং হয়েছে দিনাজপুরের জগদ্দলে। আমরা থাকি জগদ্দলের এক পরিত্যক্ত জমিদার বাড়িতে। সেই বাড়ি আমবাগানের ভেতর। কী প্রকাণ্ড সব আমগাছ! ছায়া ও ফলদায়িনী বৃক্ষরাজির আশ্রয়ে আমাদের বড় হয়ে ওঠা। শৈশবের অতি আনন্দময় স্মৃতির একটি হচ্ছে, বড়মামা আমাকে কাঁধে নিয়ে আমগাছে উঠে গেছেন। আমি এক হাতে মামার গলা জড়িয়ে ধরে আছি, অন্য হাতে পাকা আম পাড়ার চেষ্টা করছি। আম্রবৃক্ষের কথা বলতে গিয়ে নানান কারণেই নস্টালজিক বোধ করছি। নস্টালজিয়া কোনো কাজের কথা না, মূল কথায় আসি।

সম্রাট বাবর ছিলেন তরমুজ ভক্ত। তরমুজ তাঁর জন্মভূমির ফল। দিল্লির সিংহাসনে থাকা অবস্থায় তাঁর জন্মভূমি খোরশান থেকে নিয়মিত তরমুজ আসত। দিল্লির আশেপাশে তরমুজ চাষের ব্যাপক উদ্যোগ তিনি নিয়েছিলেন। তাঁর আত্মজীবনী *বাবরনামা*-য় তরমুজ বিষয়ে নানান কথা থাকবে এটাই স্বাভাবিক, সেখানে হঠাৎ যদি বঙ্গদেশীয় ফল আম সম্পর্কে উচ্ছ্বাস দেখি তখন খানিকটা অবাকই হই। সম্রাট বাবর কাঁচা আমের শরবতের মহাভক্ত ছিলেন। এই পানীয় বিষয়ে তিনি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে গেছেন। কাঁচা আমের শরবতের রেসিপি *বাবরনামা*-য় আছে। কৌতূহলী পাঠক সেই রেসিপিতে শরবত বানিয়ে খেয়ে দেখতে পারেন।

আমরা বঙ্গবাসী। আমের প্রতি দুর্বলতা সম্ভবত আমাদের 'জিনেই' লেখা। আমাদের শৈশবের লেখাপড়ার শুরুই হয় আম দিয়ে— 'অ তে অজগর। অজগর আসছে ধেয়ে। আ-তে আম। আমটি আমি খাব পেড়ে।'

ছড়া মুখস্থ করার সময়েও সেই আম।

'আম পাতা জোড়া জোড়া
মারব চাবুক চড়ব ঘোড়া।'

রবীন্দ্রনাথ শৈশবে প্রথম যে কবিতাটি লিখেছিলেন সেখানেও 'আম' ছিল। বেশির ভাগ পাঠকই হয়তো কবিতাটি জানেন। যারা জানেন না তাদের জন্যে—

'আমস্বত্ব দুধে ফেলি তাহাতে কদলী দলি
সন্দেশ মাখিয়া দিয়া তাতে
হাপুস হুপুস শব্দ, চারিদিক নিস্তব্ধ
পিঁপিড়া কাঁদিয়া যায় পাতে।'

খনার বচনেও আম—

'আমের বছর বান
কাঁঠালের বছর ধান
থেকে বলদ না বায় হাল
তার দুঃখ সর্বকাল।'

আমাদের নুহাশ পল্লীতে সত্তরটা ভিন্ন প্রজাতির আমগাছ আছে। একটি বিশেষ প্রজাতির উল্লেখ করছি, পাঠকরা শুনে আনন্দ পাবেন। এই বিশেষ প্রজাতির আমের নাম 'কাক দেশান্তরী'। এই আম এতই টক যে, কাক খেলে মনের দুঃখে দেশান্তরী হয়।

আমের বোটানিক্যাল নাম *Mangifera indica Linn.*

পরিবার Anacardiaceae.

আমের রসায়ন

১. আমে আছে ভিটামিন A, B, C এবং D; আছে ascorbic acid.
২. Carotenoid pigments.
৩. Glycosides, যেমন pensnidin, 3-galactoside.
৪. UDP—glucosepyrophosphorylase,
   ADP— glucosepyrophosphorylase,
   UDP— glucose fructose-ß-phosphate.
৫. Nucleoside diphosphate kinase.
৬. Ethylgallate, Phenol, Starch.

ভেষজ ব্যবহার

- আমাশয় : কচি আমপাতার রস সামান্য গরম করে দিনে দুই বা তিন চামচ করে খেলে আমাশয় সারবে। কোনো কোনো বইতে আমপাতার সঙ্গে জামপাতাও মেশাতে বলা হয়েছে।
- পোড়া ঘায়ে : আমপাতা আগুনে পুড়িয়ে ছাই বানিয়ে সেই ছাই ঘায়ে মাখলে ঘা সারবে।

- **চুল পড়া বন্ধ করতে : কচি আমের আঁটি খেতলে পানিতে ভেজাতে হবে।** সেই পানি চুলের গোড়ায় লাগালে চুল পড়া বন্ধ হবে।
- **পা ফাটায় :** যাদের পায়ের গোড়ালি ফাটে, তারা যদি সেখানে আমগাছের আঠার প্রলেপ দেন তাহলে ফাটা বন্ধ হবে।
- **নখকুনি :** নখকুনির মতো বিরক্তিকর রোগে যারা কষ্ট পাচ্ছেন, তারা আমগাছের আঠা নখের গোড়ায় দিয়ে দেখতে পারেন।
- **দাঁত সুরক্ষা :** বাজার ভর্তি নানান ধরনের টুথপেস্ট। টুথপেস্ট বাদ দিয়ে কচি আমের পাতায় দাঁত মেজে দেখেছেন কখনো? বলা হয়ে থাকে দাঁত সুরক্ষায় এর কোনো বিকল্প নেই।
- **খুশকি :** খুশকির একটি মহৌষধ হলো, কচি আমের আঁটি এবং হরীতকী দুধে বেটে মাথায় দেয়া।
- **রক্তপিত্তে (হেমোপটোসিসে) :** মিষ্টি পাকা আম এর চমৎকার ওষুধ।
- **ডায়াবেটিস :** আমের নতুন পাতা শুকিয়ে গুঁড়া করে খেতে হবে। এতে রক্তে সুগারের পরিমাণ কমবেই।
- **বদহজমে :** কাঁচা আম এবং কচি আমের আঁটি খেলেই হবে।

অসুখবিসুখ নিয়ে অনেক কথা হলো, এবার অন্য প্রসঙ্গ। 'সোমধারা' শব্দটি শুনেছেন? এটি অসাধারণ একটি পানীয়। প্রাচীন ভারতের সাহিত্যে সোমধারার বর্ণনা আছে। পানীয়টির রেসিপি জানিয়ে দিচ্ছি।

> **সোমধারা**
>
> উপকরণ : একটা ল্যাংড়া বা হিম সাগর আম, এক বাটি গরম দুধ।
>
> **প্রস্তুত প্রণালি :** আম দুধ একসঙ্গে মেশান। চামচ দিয়ে ফেটিয়ে নিন। এবার খেয়ে ফেলুন।

সহজ রেসিপি না?

এবার অন্যধরনের একটি রেসিপি দিচ্ছি। আম দিয়ে ককটেলের রেসিপি। এই রেসিপির আবিষ্কারক আমার বন্ধু 'প্রতীক প্রকাশনী'র মালিক আলমগীর রহমান। রেসিপির নামকরণ করেছি আমি। Bengal green mango sling. পৃথিবী বিখ্যাত কিছু ককটেলের মধ্যে একটি হলো Singapore Sling. আমার নামকরণ মৌলিক না, Singapore Sling-এর ছায়া আছে। থাকুক কিছু ছায়া, ক্ষতি কী?

Bengal green mango sling

দুই অংশ ভদকা।

পাঁচ অংশ কাচা আমের শরবত।

পুদিনা পাতা।

বিট লবণ।

একসঙ্গে মিশিয়ে ঝাঁকাতে হবে। কিছুক্ষণ রাখতে হবে ডিপ ফ্রিজে। গ্লাসে ঢেলে পরিবেশনের আগে গ্লাসের মুখে লবণ মাখিয়ে নিতে হবে। ভদকার অভাবে জিনও ব্যবহার করা যেতে পারে।

'আমের কথা ফুরালো
নটে গাছটি মুড়ালো।'

কাঁঠাল

চৈনিক ভূপর্যটক ইউয়েন সাঙ সপ্তম শতাব্দীতে বাংলাদেশে এসেছিলেন। তাঁর বর্ণনা—

> "গংগা নদী পার হয়ে ৬০০ লি পথ অতিক্রম করে উপস্থিত হলাম পদ্রুবর্ধনে (উত্তর বাংলাদেশ, বগুড়া)। প্রায় চারশ' লি আয়তনের এই রাজ্যটিতে বসতি ঘন। অনেক পুষ্করিনি। মাটি দোআঁশ। ফলে শস্য পর্যাপ্ত। বিশাল কাঁঠাল ফল এখানে সমাদৃত। এর ভেতরে পায়রার ডিমের মতো ছোট হরিদ্রাভ ফল সুগন্ধে ভরপুর। এটি ডাল ও গুঁড়ি উভয় স্থানেই ধরে।"

কাঁঠাল আমাদের স্বদেশী গাছ। রামায়ণ এবং প্রাচীন গ্রন্থ *আয়ুর্বেদিক শাস্ত্র সংহিতায়* কাঁঠালের উল্লেখ আছে। রামের ভাই ভরত ভরদ্বাজ মুনির অতিথি হয়ে মুনির বিশাল ফলের বাগান দেখে মুগ্ধ হলেন। সেই ফলবাগানে আছে—

> 'তস্মিন বিল্বা : কপিত্থাশ্চ পনসা-বীজপূরকাঃ
>
> আমলোকণে বভূশ্চ চুতাশ্চ ফলভূষিতাঃ'
>
> অর্থ : বেল, কৎবেল, কাঁঠাল, বাতাবিলেবু, আম প্রভৃতি নানান ফলজ বৃক্ষে বাগান পরিপূর্ণ। আবার শ্রীরাম যেখানে নির্বাসিত জীবনযাপন করলেন সেই পঞ্চবটি বনও ছিল— চন্দন, কদম, কাঁঠাল গাছে পরিপূর্ণ।
>
> [আমিরুল আলম খান, *ভারত বিচিত্রা*]

চিটাগাং কলেজিয়েট স্কুলে যখন পড়ি (১৯৫৭ সন), তখন আমাদের ক্লাস টিচার ছিলেন বড়ুয়া স্যার। তিনি কাঁঠালের ইংরেজি শিখালেন। কাঁঠাল Jack Fruit. আমি বললাম, স্যার Jack মানে কী?

স্যার বললেন, Jack মানে শিয়াল। কাঁঠাল শিয়ালরা খেতে পছন্দ করে বলেই এর নাম Jack Fruit. অনেকদিন পর জানলাম— Jack মানে শিয়াল না, আমজনতা। সাধারণ মানুষ। কাঁঠাল হলো সাধারণ মানুষের ফল। বিত্তবানদের ঘরে এর প্রবেশ নিষেধ। ঢাকার পাঁচতারা কোনো হোটেলে ফল হিসেবে কাঁঠাল

দিতে দেখি না। মালয়েশিয়া এবং সিঙ্গাপুরের পাঁচতারা হোটেলে কাঁঠালের মতোই যে ফল (ডুরান্ট) সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

বাংলার কবি-সাহিত্যিকরা অবশ্যি কাঁঠাল নিয়ে মুগ্ধ।

জীবনানন্দ দাশের বিখ্যাত লাইন—

তোমার যেখানে সাধ চলে যাও— আমি এই বাংলার পারে
রয়ে যাব; দেখিব কাঁঠাল পাতা ঝরিতেছে অবিরল ভোরের
বাতাসে।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে ছায়াদায়িনী বৃক্ষ হিসেবে কাঁঠাল গাছের উল্লেখ আছে। তবে কাঁঠাল ফলের কোনো বর্ণনা পড়েছি বলে মনে পড়ছে না।

কবি মাইকেল মধুসূদনই কাঁঠাল ফলের চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন—

কাঁঠাল,
যার ফলে স্বর্ণকণা শোভে শত শত
ধনদের গৃহ যেন।

কাঁঠালের বৈজ্ঞানিক নাম *Artocarpus hetrophyllus.* পরিবার Moraceae. Arto শব্দটি এসেছে গ্রীক থেকে। এর অর্থ রুটি। Carpus অর্থ ফল।

কাঁঠালের পাকা ফলে কী কী থাকে দেখা যাক। একশ গ্রাম ফলে থাকে—

শর্করা : ১৮.৮ গ্রাম
আমিষ : ১.৯ গ্রাম
স্নেহজাতীয় পদার্থ : ০.৩ গ্রাম
আঁশ : ১.১ গ্রাম
ক্যালসিয়াম : ২০ মি. গ্রাম
ফসফরাস : ৩০ মি. গ্রাম

এছাড়াও আছে পটাশিয়াম, থায়ামিন, রাইবোফ্লাবিন, ভিটামিন এ এবং সি।

কাঁঠালের বিচির খাদ্যগুণ বিষয়ে কিছু জানি না। আমি কাঁঠালের বিচি দিয়ে রান্না করা মুরগির মাংসের ঝোলের মহাভক্ত। ছোটবেলায় কাঁঠালের বিচির ভাজা অনেক খেয়েছি। খেতে বাদামের মতোই স্বাদু।

কাঁঠালের ভেষজ গুণ সম্পর্কে বলি। কাঁঠালের মূল উদরাময়ের মহৌষধ। কাঁঠালের আঠা ফোঁড়া পাকানোয় ব্যবহার করা হয়। কাঁঠালের পাতা না-কি সর্পবিষ নাশক। সর্পদংশনে পাতা কীভাবে ব্যবহার করা হয় সেই তথ্য পাই নি। নিশ্চয় পাতা বেটে মলমের মতো লাগানো হয়।

আমাদের জাতীয় ফল কাঁঠাল। কাঁঠাল নিয়ে আরো অনেক কিছু লেখা উচিত। নতুন কোনো তথ্য দিতে পারছি না বলে লিখছি না। মায়ের কাছে খালার গল্প করার তো কোনো মানে হয় না। প্রেম কী বুঝানোর জন্য কাঁঠালের ব্যবহার আছে। এটা জানিয়ে কাঁঠাল প্রসঙ্গে ইতি টানছি।

পীরিতি কী ?

পীরিতি হলো কাঁঠালের আঠা।

'পীরিতি কাঁঠালের আঠা
লাগিলে যে আর ছাড়ে না ...'

বিছুটি

আমি আমার শৈশবের কিছু অংশ নানার বাড়িতে কাটিয়েছি। নানার বাড়ির পুরুষরা দেখি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত— একশ্রেণীর সবাই আমার নানা। অন্যশ্রেণীর সবাই মামা। মামা শ্রেণীদের সঙ্গে হৈহল্লোড় করে আমার দিন কাটে। একদিন মামা শ্রেণীকে বেশ উত্তেজিত মনে হলো। তারা জঙ্গলে ঢুকে বিশেষ এক গাছের ডাল কেটে আনলেন। প্রতিটি ডালের নিচের অংশ খড় এবং কচুপাতা দিয়ে মুড়ে দেয়া হলো ধরার সুবিধার জন্যে। আমাদের সবার সঙ্গে একটা করে গাছের ডাল। ঘটনা হচ্ছে, আমাদের ফুটবল টিম যাদের কাছে হেরেছে আজ তাদের ধাওয়া করা হবে এবং এই বিশেষ গাছের ডাল দিয়ে পেটানো হবে। গাছের স্থানীয় নাম— চুতরা।

ফুটবল টিমকে পাওয়া গেল না। মাঝখান থেকে এই পাতা লেগে আমার সমস্ত শরীর ফুলে গেল। ভয়াবহ জ্বলুনি। কেউ যেন আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। চুনের প্রলেপ, সরিষার তেলের প্রলেপ, কোনোকিছুই কাজ করছে না।

পাঠকরা নিশ্চয়ই এই গাছটি চিনতে পারছেন? ভদ্রসমাজে এর নাম বিছুটি। লতানো চিরসবুজ গাছ। গাছ ভর্তি পশমের মতো সাদা লোম। গাছটার সংস্কৃত নাম বিষানী। বিছুটির একটি প্রজাতি জলজ জমিতে জন্মে। এর নাম জলবিছুটি। জলবিছুটির বিষক্রিয়া না-কি ভয়াবহ।

গাছটির বোটানিক্যাল নাম *Tragia involvcrata* Linn, সব বিছুটি ইউয়ারবিয়েসি গোত্রের।

বিষাক্ত রসায়নের মূলে আছে ভিটারপেন অ্যালকোহল, কিছু ফ্যাটি অ্যাসিড।

ঔষধি ব্যবহার

- চরক সংহিতায় বিছুটিকে উন্মাদ রোগের মহৌষধ বলা হয়েছে। কীভাবে ব্যবহার হবে তা কিন্তু বলা হয় নি।
- যখন কুষ্ঠরোগের ওষুধ বের হয় নি, তখন গাছের মূল ছেঁচে প্রলেপ হিসেবে ব্যবহৃত হতো। গ্রামে এখনো পশুর ঘায়ের পোকা বের করতে বিছুটি গাছের রস প্রলেপ হিসেবে দেয়া হয়।

লজ্জাবতী

দেশের বাইরে বেড়াতে যাওয়া মানেই কিছুটা সময় বড় বড় শপিং মলে কাটানো। সিঙ্গাপুরের এক শপিং মলের ফুলের দোকানে দেখি লজ্জাবতী গাছ। ছোট ছোট বাহারি টবে বিক্রি হচ্ছে। দাম ছয় সিঙ্গাপুরি ডলার। ব্যাপারটা বুঝলাম না। লজ্জাবতী বনেজঙ্গলে থাকবে, আগাছা হিসেবে এদের তুলে ফেলা হবে— এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। হঠাৎ এই আগাছা জাতে উঠল কীভাবে বুঝলাম না।

আমি অবশ্যি এই গুল্মের শৈশব থেকেই ভক্ত। হাত দিয়ে ছোঁয়া মাত্রই লজ্জায় কুঁকড়ে যাচ্ছে। সুন্দর লাগে দেখতে। আমি বছরখানিক আগে লজ্জাবতী গাছ নিয়ে ছোট্ট একটা এক্সপেরিমেন্ট করেছিলাম। এক্সপেরিমেন্টের ফলাফল— লজ্জাবতী গাছকে নির্লজ্জ করা সম্ভব। তার জন্যে যা করতে হবে তা হলো একটা গাছকে ছুঁয়ে তাকে কুঁকড়ে দিতে হবে। এবং গাছটার সামনে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে। সে যখন আবার পাতা মেলবে, তখন আবার ছুঁতে হবে। এই প্রক্রিয়া দীর্ঘ সময় চলতে থাকলে একটা সময়ে দেখা যাবে লজ্জাবতী আর লজ্জা পাচ্ছে না। হাত দিয়ে ছুলেই তার পাতা কুঁকড়ে যাচ্ছে না।

লজ্জাবতী গাছ কাঁটায় ভর্তি থাকে— এই তথ্য সবাই জানেন। কাঁটাগুলি থাকে নিচের দিকে (মাটির দিকে)। এই কারণেই লজ্জাবতী যেখানে থাকে, সেখানে সাপ ঢোকে না। (তথ্যটা মনে হয় ঠিক না। 'আমার আছে জল' ছবির শুটিং-এর প্রয়োজনে দু'টা সাপ ব্যবহার করা হয়েছিল। সাপ দুটাকে দেখেছি লজ্জাবতী ভর্তি মাটির ওপর দিয়ে সরসর করে চলে যাচ্ছে।)

এই গুল্মের বোটানিক্যাল নাম *Mimosa pudica* Linn.

পরিবার— Leguminosae.

রসায়ন

লজ্জাবতীতে আছে নানা ধরনের Alkaloids, Tanin এবং steroidal যৌগ। এই সঙ্গে মোমজাতীয় পদার্থ এবং Fatty acids.

ঔষধি ব্যবহার

- ভেষজ চিকিৎসকরা প্রাচীনকালে অর্শরোগে এই গুল্ম ব্যবহার করতেন। দশ গ্রাম আন্দাজ গাছ এবং মূল এককাপ দুধ এবং তিনকাপ পানিতে অনেকক্ষণ

সিদ্ধ করতে হবে। সিদ্ধ হবার পর ছাকনি দিয়ে ছেঁকে রসটা দিনে দু'বার (সকালে ও বিকালে) খেতে হবে।

- দুষ্টক্ষতে লজ্জাবতীর ক্বাথ ব্যবহারের বিধান আছে। ক্ষত সারছে না। দূষিত হয়ে মাংস গলে পড়ে যাচ্ছে, এমন অবস্থায় এক ক্বাথ দিনে তিন-চারবার লাগালেই নাকি আরাম হয়। (শিবকালী ভট্টাচার্য)
- ক্যানসারেও না-কি-এর ব্যবহার আছে। এই বিধানে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে বলেই নীরব থাকলাম।

আতা

আতাগাছকে ইংরেজিতে বলে 'সুইট সপ'— মিষ্টি দোকান। আমেরিকায় বলে সুগার আপেল। আরবি নাম শরিফা। এ দেশের অনেকেই শরিফা নামে চেনে। আমি ছোটবেলায় যে ফলকে আতাফল বলে চিনতাম সেটা আসলে নোনাফল। নামের এই ঝামেলা আমার মতো আরো অনেকের আছে।

পথের পাঁচালী-র দুর্গা নোনাফল চুরি করেছিল। সেই নোনা কিন্তু শরিফা না।

আমাদের মীরাবাজারের বাসায় প্রকাণ্ড একটা আতাগাছ ছিল। যখন ফল আসত এমনভাবে আসত যে গাছের পাতা দেখা যেত না। আমি আমার দীর্ঘ জীবনে কোনো গাছকে এত ফল দিতে দেখি নি। ছোটবেলায় আতাফল প্রচুর খেতে হয়েছে বলেই হয়তো এই ফল এখন আমার অপছন্দের তালিকায়।

আগরতলা থেকে প্রকাশিত প্রশান্ত কুমার ভট্টাচার্যের লেখা *বিষাক্ত গাছ থেকে সাবধান* বইটিতে আতাগাছকে বিষাক্ত তালিকায় ফেলা হয়েছে। বলা হয়েছে, আতাগাছের মূল, বীজ, পাতা, কাঁচাফল সবই বিষাক্ত। আয়ুর্বেদাচার্য শিবকালী ভট্টাচার্য *চিরঞ্জীব বনৌষধি* বইয়ে এই গাছের পাতা, বীজ, ফল কোনো কিছুই যেন গর্ভবতী মেয়েরা ব্যবহার না করে— এই সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন। আন্দামানের সেলুলার জেলে এই গাছের পাতার রস চোখে লেগে অন্ধ হয়ে যাবার ঘটনাও না-কি ঘটেছে।

গ্রামে এই গাছের কাঁচা ফল ও পাতার রস গোপন গর্ভপাতে ব্যবহার করা হয়। এতে জরায়ু অতি দ্রুত সংকুচিত হয়। গর্ভপাতের পর প্রচুর রক্তক্ষরণে মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে অনেক বেশি।

গাছের পাতা ও বীজে একধরনের এলকালয়েড থাকে (এনোলাইন, সোয়াডিনোলাইন)। গাছটির কোনো অংশেই গ্লুকোসাইড থাকে না। বীজ থেকে পাওয়া তেলে থাকে সেসকিওটারফিন, পাইনিন, মিথানল, বেনজিন, মিথাইল এনথ্রানাইলেট, সেলিসাইলেট। কিছু পরিমাণে সেপোনিনও থাকে।

গাছটার বোটানিক্যাল নাম *Annona quamosa*।

পরিবার হলো Anonaceae।

আতাগাছ ভারতবর্ষের গাছ না বলে অনেকে মনে করেন। কারণ প্রাচীন কোনো আয়ুর্বেদ গ্রন্থে (চরক, শুশ্রুত) এই গাছের কোনোরকম উল্লেখ নেই।

ঔষধি ব্যবহার

গাছের পাতা, ফল এবং বীজ কীটনাশক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। গাছের পাতার রস মাথার উকুন ধ্বংসে কাজে লাগে। ব্রণ, পুরনো ক্ষতে পাতার রস কাজে আসে। জীবজন্তুর ক্ষতে পোকা হলে গাছের পাতার রস লাগালে পোকা মরে যায়।

ঢেঁকিশাক

নিউমার্কেটের কাঁচাবাজার থেকে একবার ঢেঁকিশাক কিনে আনলাম। নানার বাড়িতে এই শাক অনেক খেয়েছি। স্মৃতি তেমনভাবে নেই। এখন খেয়ে দেখা যাক। আমাদের কাজের মেয়ে ঢেঁকিশাক দেখে আঁতকে উঠল। এই শাক না-কি খাওয়া যাবে না। বিষাক্ত। সে কিছুতেই রাঁধবে না। তার কঠিন অবস্থানের কারণে শাক ফেলে দিলাম। বইপত্র ঘেঁটে দেখি আসলেই ঢেঁকিশাক অতি বিষাক্ত। ইংরেজিতে এর নাম মেইল ফার্ন। বোটানিক্যাল নাম *Dryopteris filixmas.* আমেরিকা এবং ইউরোপে এই ফার্ন অতি বিষাক্ত হিসেবে পরিচিত। বনের গাছ হলেও আফ্রিকায় কিন্তু এই গাছ অনুপস্থিত।

ফার্নের বিষাক্ত যৌগটির নাম ফিলিসিন। ফিলিসিন হচ্ছে ডাইমেরিক, ট্রাইমেরিক এবং টেট্রামেরিক বোটানল ফ্লোরো গ্লুসীড-এর মিশ্রণ।

ফিলিসিন যৌগটি কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের ওপর কাজ করে। এই বিষের কারণে প্রবল ভেদবমি শুরু হবে, শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত হবে, চোখের মণি ঠিকরে বের হয়ে আসার মতো হবে, এক পর্যায়ে শরীরে কাঁপুনি হতে হতে...

প্রিয় পাঠক! ঢেঁকিশাক না খেলে হয় না ?

তালগাছ

আমাদের জাতীয় ফুল আছে, ফল আছে। জাতীয় বৃক্ষ বলে কিছু কি আছে? কানাডা নামের দেশটির প্রতীক মেপল গাছের পাতা। তাদের জাতীয় বৃক্ষ কিন্তু মেপল না। বৃক্ষকে কেউ এত গুরুত্ব দেয় না।

ধরা যাক, বাংলাদেশ কোনো এক বৃক্ষকে জাতীয় বৃক্ষ ঘোষণা করবে। তাহলে সেই সম্মান কে পাবে? বটবৃক্ষ কি পাবে? সম্ভাবনা আছে। তবে আমি বলব তালগাছের কথা। বন-ঝোপঝাড় ছাড়িয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা তালগাছ। যে সব গাছ ছাড়িয়ে উঁকি মারে আকাশে।

তাল পাম জাতীয় দীর্ঘজীবি উদ্ভিদ। মূল আবাসভূমি মধ্য আফ্রিকা। বৈজ্ঞানিক নাম *Borassus flabellifer* Linn. পরিবার হলো Palmae.

তালের রসে আছে Riboflabin এবং ভিটামিন B Complex.

বৈদিক গ্রন্থে যে সোমরসের কথা লেখা আছে তা তালের রস। দেবতাদের পছন্দের পানীয়। দেবতাদের কথা জানি না, মর্তের মানুষদের কাছেও কিন্তু তালের রস থেকে বানানো তাড়ির যথেষ্ট চাহিদা আছে। প্রচণ্ড গরমের সময় সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে কলসিভর্তি তালের রসের তাড়ি বিক্রি হয়। রসিক জন বলেন, অসাধারণ।

তালপাতার পাখার ব্যবহার তো সবাই জানেন। আরেকটি ব্যবহারের কথা বলি। যখন দেশে কাগজ ছিল না, তখন লেখা হতো তালের পাতায়। তালপাতায় লেখা অনেক পুঁথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহশালায় আছে।

বসতবাড়ির আশেপাশে কখনো তালগাছ রাখা হয় না। কারণ হলো, এই গাছগুলি ৫০ থেকে ৬০ ফুট উঁচু হয় বলে ঝড়-বাদলার দিনে এদের উপরে বাজ পড়ে।

তালরস-বিষয়ক আরেকটি কথা, এই রস সূর্য ওঠার আগে খেলে মহৌষধ। সূর্য উঠে যাবার পরে খেলে সাড়ে সর্বনাশ।

অবনীভূষণ ঠাকুরের লেখা *ভেষজ উদ্ভিদ ও লোকজ ব্যবহার* বইয়ে তালের রসের একটি ওষধি ব্যবহার পড়ে মজা পেয়েছি। সরাসরি তুলে দিচ্ছি—

> অনেকে আছেন অনর্গল কথা বলেন, বকবকানিতে সকলেই বিরক্ত, কিন্তু এর যেন শেষ নেই। এরূপ ক্ষেত্রে এক

থেকে দেড় কাপ টাটকা তালের রস সকাল-বিকাল কয়েকদিন দু'বেলা খাইয়ে দেবেন। এতে উপকারিতা প্রত্যক্ষ করতে পারবেন।

তালগাছ বিষয়ে আমার একটা প্রশ্ন। এত গাছ থাকতে বাবুই পাখি তালগাছে বাসা বাঁধে কেন?

নীলমণি লতা

ঘৃতকুমারী

করমচা

শয়তানের গাছ / ছাতিম

আমার খুব পছন্দের একটা গাছের ইংরেজি নাম Devil's tree, শয়তানের বৃক্ষ। এত সুন্দর একটা গাছের নাম শয়তানের বৃক্ষ হবার পেছনের কোনো কারণ আমি বের করতে পারি নি। নামের উৎপত্তি বিষয়ে কেউ কিছু বলতে পারে না।

বাংলা নাম এসেছে ছাতা থেকে। ডাল থেকে বের হওয়া পাতাগুলির এমনই অপূর্ব বিন্যাস, দেখে মনে হয় কিছু ছাতা জোড়া দেয়া হয়েছে। গাছটার আরেক নাম সপ্তপর্ণী। একই গ্রন্থি থেকে সাতটা পাতার বিন্যাসের জন্যেই সপ্তপর্ণী নাম। এর আরেক নাম মদগন্ধ। কারণ হচ্ছে, যখন এই গাছে ফুল ফোটে (শরৎকাল) তখন ফুল থেকে নেশা ধরানো তীব্র গন্ধ বের হয়। এই গন্ধের ভেতর দীর্ঘসময় থাকলে মানুষ সত্যি সত্যি নেশাগ্রস্ত হয় এমন জনশ্রুতি আছে।

নুহাশ পল্লীর মূল বাংলোর সামনে দু'টা ছাতিম গাছ লাগানো হয়েছে। গাছ দু'টি দ্রুত বড় হচ্ছে। আমি ফুল ফোটার জন্যে অপেক্ষা করছি। ফুল ফুটলেই ফুলের গন্ধে নেশা করার পরিকল্পনা আছে।

গাছটির বোটানিক্যাল নাম *Alstonia scholaris*। পরিবার এপোসাইন্যাসী।

প্রাচীন আয়ুর্বেদিক গ্রন্থ *চরক সংহিতা*-য় ছাতিম গাছের ব্যবহার দেখানো হয়েছে কুষ্ঠরোগে। কুষ্ঠরোগের এখন অতি আধুনিক চিকিৎসা বের হয়েছে, কাজেই প্রাচীন আর্য়ুবেদ নিয়ে হৈচৈ করার প্রয়োজন দেখছি না।

স্তন্য শোধনে ছাতিমের ব্যবহারের উল্লেখ প্রাচীন বইয়ে আছে। স্তন্য শোধন বিষয়টা আমি বুঝতে পারছি না। প্রাচীন আয়ুর্বেদরা কি Brest cancer এর কথা বলছেন?

রসায়ন

ছাতিম গাছ থেকে অনেক এলকালয়েড (নাইট্রোজেনগঠিত যৌগ) পাওয়া গেছে। যেমন— এসিটামাইসিন, পিক্রিনিন, পিক্রালিনাল, স্ট্রিক্টামিন, একুয়াম্মিডিন। ছাতিম গাছের ফুলে আছে n-হেক্সাকোসেন, লুপিয়ল, বিটা এমিরিন। ফুল থেকে আসা তীব্র মদালসা গন্ধের জন্যে কে দায়ী জানা যাচ্ছে না।

গাব

বাংলাদেশের বনেজঙ্গলে, ঝোপঝাড়ে একসময় প্রচুর গাবগাছ দেখা যেত। এখন তেমন দেখি না। শত শত নার্সারি হয়েছে, কোথাও খুঁজে গাবগাছ পাই নি। তাদের কাছে পাওয়া যায় নানান জাতের আম। ইদানীং যুক্ত হয়েছে বিদেশী ফল ও ফুলের গাছ। গাবগাছের কৌলিন্য কোনো কালেই ছিল না। এখন আরো নেই।

গ্রামে গাবগাছের কাঠ দিয়ে ঢেঁকি তৈরি হতো। এখন তো ঢেকিই উঠে গেছে। ধানের কলে ধানভানা হয়। মাছ ধরার জালের সুতা শক্ত করার জন্যে গাবের রস লাগানো হতো। এখনকার নাইলনের জালের সুতা শক্ত করার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। নৌকার তলায় গাবের রস লাগনো হতো, কাঠ পঁচে নষ্ট যেন না হয়। এখন আলকাতরা দেয়া হয়। সর্ব অর্থেই মনে হচ্ছে— 'হে গাব বৃক্ষ! তোমাকে বিদায়।'

আমার শৈশবে নানার বাড়িতে প্রচুর পাকা গাব খেয়েছি। এমন কিছু অসাধারণ ফল না, তবে শৈশবে সব ফলই অসাধারণ লাগে।

গাবগাছের কাঠ যে অতি বিখ্যাত আবলুস কাঠের গোত্রে (Ebony) পড়ে এই তথ্য কি আপনারা জানেন ? মনে হয় জানেন না। আমি নিজেও অনেক দিন জানতাম না।

নুহাশ পল্লীর বাগানে দু'টা গাবগাছ আছে। আদরযত্নে এরা তেমন অভ্যস্ত না বলে খানিকটা চিমসা মেরে আছে। যারা গাবগাছের চেহারা ভুলে গেছেন তাদেরকে নুহাশ পল্লীর বাগানে নিমন্ত্রণ।

গাছটির বোটানিক্যাল নাম *Diospyros peregrina.*

পরিবার হলো Ebenaceae.

গাবগাছের পাতা তরকারি করে খাওয়া হয়। শুনেছি খেতে খুব ভালো। মোচার ঘন্টের মতো করে রাঁধতে হয়। রান্নার আগে পাতা পানিতে সিদ্ধ করে সেই পানি ফেলে দিতে হবে।

ঔষধি ব্যবহার

- আমাশয় : গাবগাছের ছালের রস, ছাগলের দুধের সঙ্গে মিশিয়ে খেতে হবে। ছাগলের দুধ জোগাড় করতে না পারলে ফার্মেসি থেকে আমাশার ওষুধ কিনে

নেবেন। আমার মতে এটাই ভালো বুদ্ধি।

- ডায়াবেটিসে : গাবগাছের ছালের রস এক চামচ করে ভোরবেলা খেতে হবে। ডায়াবেটিসে অসংখ্য ঔষধি বৃক্ষের উল্লেখ দেখি। কোনোটাই কি কাজ করে? আমি skeptical মানুষ।
- ক্যানসারে : গলার এবং জিভের ক্যানসারেও গাবগাছের রসের ব্যবহার আছে।

রসায়ন

গাব ফলে এবং গাছে আছে Tanin, Tannic acid এবং Malic acid. সামান্য Fatty oil, ভিটামিন C এবং ভিটামিন B Complex (ফলে)।

ধূপগাছ / গুগগুল

কয়েক বছর আগে নার্সারি থেকে ধূপগাছ নামের একটা গাছ কিনলাম। বইপত্রে ধূপগাছ বলে কোনো গাছ নেই। এর বৈজ্ঞানিক নাম কী, কোন পরিবারের গাছ কিছুই জানি না। সাইনবোর্ড ছাড়াই এই গাছ বড় হচ্ছে। স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যে ঝলমল করছে।

যাই হোক এখন গাছের নাম জানি। বাংলায় গুগগুল। ইংরেজিতে Indian Bdellium tree. বৈজ্ঞানিক নাম— *Commiphora mukul* Engl. পরিবার হলো Burseraceae.

মার্চ-এপ্রিলে এই গাছে ফুল ফোটে। ফল আসে শীতকালে। ফুলের রঙ সাদা। ফল কেমন এখনো জানি না।

পাকিস্তান, ভারত এবং বাংলাদেশে গুগগুল গাছ প্রচুর জন্মানোর কথা। আমি বাংলাদেশে এই গাছ দেখি নি।

এই গাছের আঠার গন্ধ ধূপের মতো। ধূপের সঙ্গে গুগগুল মেশানো হয় বলেই এর নাম ধূপ ধুনো। এখন কেউ যদি বলেন, ধুনোটা কী ? আমি বলতে পারব না। জানার চেষ্টা করছি।

আগরবাতি তৈরিতে গুগগুল ব্যবহার হয়। আতর তৈরিতেও গুগগুল লাগে।

ওষুধি ব্যবহার

- গুগগুল রক্তের কলেস্টরল নিয়ন্ত্রণ করে। চর্বি কমাতে সাহায্য করে।
- গনোরিয়া রোগ নিরাময়ে একসময় ব্যবহার হতো। প্রাচীন বইপত্রে উপদংশ রোগে এর ব্যবহার দেখা যায়। পারদ (মারকারি), নারিকেল তেল এবং গুগগুলের আঠা দিয়ে তৈরি মলম পুরাতন ক্ষত চিকিৎসায় ব্যবহার করা হতো।

বকুল / সদাপুষ্প

আমার জন্যে বকুল নস্টালজিক গাছ। সিলেটের মীরাবাজারে প্রকাণ্ড একটা বকুলগাছ ছিল। আম-কাঁঠালের ছুটির আগের দিন আমি বকুল ফুল কুড়াতে যেতাম। বকুল ফুলের মালা, মুড়ির মালা স্কুলের শিক্ষকদের উপহার দেবার রীতি ছিল। মৃত মানুষদের ছবিতেও বকুল ফুলের মালা ঝুলত। আমার এক ফুপু অল্পবয়সে মারা গিয়েছিলেন। আমাদের বসার ঘরে বিখ্যাত সব মানুষদের (রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জর্জ বার্নাডশ...) ছবির পাশে ফুপুর একটা ছবিও ঝুলত। ছবির সঙ্গে বকুল ফুলের মালা। বকুল এমন এক পুষ্প, যা শুকিয়ে গেলেও গন্ধ বিলায়।

নস্টালজিক এই ফুলের প্রভাব এখনো আমার মধ্যে আছে। আছে বলেই 'আমার আছে জল' ছবির গান লিখতে গিয়ে লিখলাম—

কত না প্রণয়
ভালোবাসাবাসি।
অশ্রু সজল
কত হাসাহাসি।
বকুল গন্ধ রাতে।

যাই হোক, বকুলের বৈজ্ঞানিক নাম *Mimusops elengi* Linn. পরিবার হলো Sapotaceae. বকুলের সংস্কৃত নাম মদন।

প্রাচীনকালে বকুল ফুল থেকে অতি উৎকৃষ্ট মদ তৈরি হতো। শিবকালী ভট্টাচার্য লিখছেন— 'চরকের সূত্র স্থানের ২৫ অধ্যায়ে আসব-যোনির মধ্যে অর্থাৎ ফলজাত যত প্রকার মদ্য শ্রেষ্ঠতার স্থান দখল করে তাদের মধ্যে বকুল ফলজাত মদ্য অন্যতম।'

বকুল ফলের মদ তৈরির একটি প্রক্রিয়া জানাচ্ছি। আবগারী বিভাগ খবর না পেলেই হলো।

পাকা বকুল ফল থেকে খোসা এবং বীজ সরিয়ে ফেলতে হবে। এর সঙ্গে মেশাতে হবে মধু কিংবা গুড়। ফার্মেনটেশনের জন্যে পাতলা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে তিনদিন। ন্যাকড়ায় পুটলি বেঁধে ঝুলিয়ে দিতে হবে। ফোঁটা ফোঁটা যে বস্তু পড়বে তাই উৎকৃষ্ট মদ। নাম দেয়া যাক— Bakul White Wine of Bengal.

- শুক্রতারল্যে : বকুল ফুলের মদ। প্রত্যহ সেব্য। (শিথিলতায়)
- প্রোস্টেড গ্ল্যান্ড সমস্যায় : ঐ

ছোট্ট একটা তথ্য দিয়ে লেখা শেষ করছি। আমার মা কিশোরী বয়সে এক হিন্দু কিশোরীর সঙ্গে বকুল ফুল পাতিয়েছিলেন। অর্থাৎ সই পাতিয়েছিলেন। এই সইয়ের কাছে আমি মাতৃ আদর সবসময় পেয়েছি। সই পাতাতে সবাই বকুল ফুলের নাম নেয় কেন? আজ পর্যন্ত কাউকে পাই নি যে সইয়ের সঙ্গে পদ্মফুল বা গোলাপফুল পাতিয়েছে।

মাকাল

এদেশের বেশিরভাগ রূপবান ছেলেকে 'ব্যাটা মাকাল ফল' ধরনের গালি শুনতে হয়েছে। পাকা মাকালের ভুবনমোহিনী রূপ। গুণ কিছুই নেই। বিষাক্ত ও তিক্ত। এই ফল ঝোপঝাড় আলো করে বসে থাকে। মানব সম্প্রদায়ের কেউ তার কাছে যায় না, তবে পাখিরা যায়।

মাকালকে অনেকে তেলাকুচাও বলেন। এটা ভুল। একই পরিবারের হলেও মাকাল আপেলের মতো গোল। তেলাকুচা কাঁচা অবস্থায় অবিকল পটলের মতো। পাকলে টকটকে লাল। তেলাকুচায় বারোমাসই ফুল ফোটে ফল ধরে।

বৈজ্ঞানিক নাম *Coccinia cordifolia cogn.*

পরিবার Cucurbitaceae.

নুহাশ পল্লীতে মাকাল ফলের কোনো গাছ নেই। যে গাছ অযত্নে ঝোপঝাড়ে জন্মে, সেই গাছ পাচ্ছি না— এটা বিস্ময়কর। ব্র্যাকের কর্মচারী বৃক্ষপ্রেমিক আবদুল্লাহ আমাকে অপ্রচলিত গাছগাছড়া জোগাড় করে দেন। তিনিও মাকাল ফল পাচ্ছেন না। আশ্চর্য।

ঔষধি ব্যবহার

- এর প্রধান ব্যবহার বমি করানোয়। কেউ এমন কিছু খেয়ে ফেলেছে যে বমি করাতে হবে। তেলাকুচা ফলের রস এক চামচ মুখে দিলেই হলো।
- ডায়াবেটিস : যে-কোনো তিতা ফলকেই ডায়াবেটিসের ওষুধ ভাবা হয়। তেলাকুচার ক্ষেত্রেও তাই। এর পাতা এবং মূলের রস না-কি ডায়াবেটিসের মহৌষধ।
- হাঁপানি : বংশগত হাঁপানিতে পাতা এবং মূলের রস। কতটুকু খেতে হবে জানি না।
- পান্ডুরোগে : পান্ডু মানে জন্ডিস, আবার পাতা ও মূলের রস।

লেখা শেষ করার আগে বলি, গ্রামদেশে মাকাল ফলের পাতা ও ডাঁটা লাউশাকের মতো ঝোল করে খাওয়া হয়। খেতে জঘন্য। আমি ভুক্তভোগী।

রিঠা

রিঠার ইংরেজি নাম সাবান বৃক্ষ— Soap plant. একটা সময় ছিল যখন সাবান আবিষ্কার হয় নি, গা পরিষ্কার করা হতো সাজিমাটি দিয়ে। মাথার চুল পরিষ্কারে ব্যবহার করা হতো এই গাছের পাতা। পানিতে পাতা ঘষলেই সাবানের মতো ফেনা হতো।

শুনেছি এই যুগেও বড় বড় বিউটি পার্লারে রিঠা গাছের ফল দিয়ে চুল ধোয়া হয় শ্যাম্পুর বিকল্প হিসেবে। এতে চুল না-কি উজ্জ্বল ঝকঝকে হয়।

রিঠা গাছের ফলে আছে সেপুনিন। এই সেপুনিনই সাবানের বিকল্প। ফল দিয়ে কাপড় ধুলে কাপড়ও পরিষ্কার হবে।

রিঠার বৈজ্ঞানিক নাম *Sapindus mukorossi* Gaertn.

পরিবার Sapindaceae

এই গাছ গ্রামবাংলার বনেজঙ্গলে একসময় প্রচুর দেখা যেত। এখন দেখা যায় না। নুহাশ পল্লীতে একটি মাত্র রিঠা গাছ আছে। গাছটি ক্রমেই লম্বা হয়ে আকাশ ছোঁয়ার ভাব করছে। এরকম হবার কথা না।

রিঠা গাছের কাঠ বেশ শক্ত। তেলের ঘানিতে এই কাঠ ব্যবহার করা হয়। এর বিশেষ কোনো কারণ আছে কিনা জানি না।

এই গাছের শিকড়েও প্রচুর সেপুনিন আছে। সাবানের বিকল্প হিসেবে সেপুনিন ব্যবহার করা যেতে পারে।

—

www.allbdbooks.com

তেলাকুচা

এক ভোরবেলায় জনৈক ভদ্রলোককে দেখলাম ভ্রূ কুঁচকে নুহাশ পল্লীর ঔষধি বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাঁর হাতে কলম এবং একটা নোটবুক। মাঝে মাঝে নোটবুকে কী সব লেখাও হচ্ছে। আমি আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে গেলাম। ভদ্রলোক হতাশ গলায় বললেন, আসল গাছটাই তো আপনার এখানে নেই!

আমি বললাম, আসল গাছ কোনটা?

আসল গাছ হলো 'বিম্বী'। কী বাগান করলেন যেখানে বিম্বী নেই!

আমি বললাম, নামটা প্রথম শুনলাম।

ভদ্রলোক বললেন, বিম্বী হলো আমাদের দেশের তেলাকুচা। যার ফলের নাম মাকাল ফল। এখন চিনেছেন?

মাকাল গাছ আসল গাছ?

অবশ্যই। ডায়াবেটিসের যম। তেলাকুচার তিনটা পাতা নিবেন। আগুনের তাপে একটু গরম করে দুপুরে খাবার পর খাবেন। আপনার ডায়াবেটিস যদি না সারে, আমার একটা কান কেটে তেলাকুচা গাছের কাছে পুতে দিয়ে যাব।

আমি বললাম, সেখান থেকে 'কর্ণগাছ' বের হবার কোনো সম্ভাবনা কি আছে?

ভদ্রলোক বললেন, আমি শিক্ষক মানুষ। নিজে রসিকতা করি না। অন্যে যখন করে, সেটাও পছন্দ করি না। তেলাকুচা গাছ সম্পর্কে যা বলেছি ঠিকই বলেছি। বইপত্র পড়ে দেখবেন। গাছ বিষয়ে কিছু জানেন না, বাগান বানিয়ে বসে আছেন!

ভদ্রলোক চলে যাবার পর আয়ুর্বেদাচার্যের বই খুললাম। সেখানে সত্যি সত্যি লেখা—

'অনেক সময় আমরা মন্তব্য করি, তেলাকুচার পাতার রস খেলাম, আমার ডায়াবেটিসের সুফল কিছুই হলো না। একটা বিষয়ে যোগে ভুল হয়ে গিয়েছে। এই রোগ তো আর একরকম দোষে জন্ম নেয় না। এক্ষেত্রে তেলাকুচার পাতা ও মূলের রস তিন চামচ করে সকালে ও বৈকালে একটু গরম করে খেতে হবে। এর দ্বারা রোগী তিন-চার দিনে সুস্থতা বোধ করবেন।'

তেলাকুচার বোটানিক্যাল নাম *Coccinia indica cogn.*

তেলাকুচা Cucurbitaceae পরিবারের গাছ।